একক 3 ❑ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : তিনসঙ্গী

3.0 ভূমিকা

3.1 রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারায় তিনসঙ্গীর স্থান

3.2 ছোটগল্পের শিল্পতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী

3.2.1 তিনসঙ্গীর বিভিন্ন গল্পের পাঠবিশ্লেষণ

3.2.2 রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ঃ শেষকথা

3.2.3 রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ঃ ল্যাবরেটরি

3.3 গ্রন্থপঞ্জি অথবা পঠনীয় গ্রন্থ

3.4 নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৩.০ ভূমিকা ঃ

৩.১ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারায় তিনসঙ্গীর স্থান ঃ

রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী' তে গ্রথিত ছোটগল্পত্রয়ী— 'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরী' সমালোচনামূলক উপলব্ধির জন্য গল্পকাররূপে রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা প্রথমেই জানা প্রয়োজন। অতঃপর জানতে হবে ছোটগল্পের Theory অথবা শিল্পকলা। তিনটি ছোটগল্পের প্রত্যেকটির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং তাদের প্লট বা কাহিনী, চরিত্র, পরিণাম-উপসংহার, ভাষা-সংলাপ-আঙ্গিক ও জীবনদর্শন সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত প্রয়োজন। চরিত্রের সঙ্গে অবস্যই সম্পৃক্ত হবে অনস্তত্ব ও মনস্তত্ব-বিশ্লেষণমূলক আলোচনা যেহেতু রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান তথা মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতের প্রাধান্য আছে। পরিশেষে উপসংহাররূপে সংযোজিত হতে পারে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকাশিত সার্বিক মানবতাবাদ সম্বন্ধে কিছু কথা। 'তিনসঙ্গী'-র ছোটগল্প তিনটিতে এই মানবতাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নারীর স্বাধীনতাপিপাসা— প্রেমের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সহযোগিতায় এবং অবদমিত প্রতিযোগিতায় তার নিজস্ব সত্তাকে আবিষ্কারের সাধনা। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের ছোটগল্পে নারীর এই বিদ্রোহিনী পরিচিতি ও ব্যক্তি(ত্বময়ী রূপ খুবই মূল্যবান।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। ....আমার ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত এখানেই।'' রবীন্দ্রনাথ সাধনা এবং ভারতীতেও ছোটগল্প লেখেন। তাঁর ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত অবশ্য হিতবাদীরও আগে। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ছোটগল্প' প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত লেখা গল্পসমূহ থেকে ষোলোটি গল্প বেছে নিয়ে। অতঃপর কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রগল্প' প্রথমভাগ, 'কথাচতুষ্টয়' ও 'গল্পদশক'। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পলেখার প্রবাহ, মাঝেমধ্যে বিরতি থাকলেও প্রায় আজীবনই চলতে থাকে। গল্পগুচ্ছ প্রথমখণ্ড ১লা আশ্বিন ১৯০০ সালে হয়েছিল। দুইখণ্ডে মোট গল্পসংখ্যা ৫৩। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের গল্পের সংকলন ''গল্পগুচ্ছ'' নামে তিনখন্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত 'গল্পগুচ্ছ' এরই পরিবর্ধিত সংস্করণ। গল্পসংখ্যা ৮৪। 'সাধনা'র যুগে পদ্মাপর্বে কবির ছোটগল্প লেখার প্রাচুর্য দেখা যায় (১২৯৮-১৩০২)। 'তিনসঙ্গী'র তার শেষদিকের লেখা গল্পগ্রন্থ, প্রকাশকাল ১৯৪০-৪১। এখানে সংকলিত 'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি' গল্পত্রয়ীকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত(করা যায়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী (১-৪ খন্ড) এবং ''রবীন্দ্রজীবনকথা''র সাক্ষ্যে জানা যায় তাঁর 'ছোটগল্প' বইটি যে বছরে প্রকাশিত হয় সে বছরেই প্রকাশিত হয় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠকাব্য 'সোনারতরী' (১৮৯৪)। অর্থাৎ তখন চলছিল কবির জীবনে পদ্মবাসপর্ব। চিত্রা কাব্যের প্রকাশ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলি যখন লেখা হয় তার কাছাকাছি সময়ে পাচ্ছি 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য (১৯৪১) প্রভৃতি কাব্য, 'ছেলেবেলা' (১৯৪০), 'গল্পস্বল্প' (১৯৪১), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ। এই তথ্য মূল্যবান কারণ লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবন পদ্মাপর্বে লেখা ছোটগল্পগুলিতে রোমান্টিকতা অর্থাৎ কল্পনার প্রাধান্য, মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য, প্রেমের প্রথম মাধুরী ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে, শেষজীবনের ছোটগল্পে সভ্যতার ক্রান্তিকালের পটভূমিকায় মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, ভাষার শানিত প্রয়োগ ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে।

অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ''বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'' গ্রন্থের ''রবীন্দ্রনাথ'' নামক অধ্যায়ে পরিসমাপ্তি অংশে রবীন্দ্রাথের ছোটগল্পসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত দিকনির্দেশক আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প তাঁর মতে রোমান্টিক ছোটগল্প। প্রেম, সামাজিক জীবনে সম্পর্কবৈচিত্র, প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গযোগ ও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ তার গল্পের বিবিধ লক্ষণ। মহামায়া, সমাপ্তি, মাল্যদান, শাস্তি, অধ্যাপক, দৃষ্টিদান, মধ্যবর্তিনী, পোষ্টমাস্টার, কাবুলীওয়ালা, হৈমন্তী, অতিথি, সম্পত্তিসমর্পণ, নিশীথে, মণিহারা, ক্ষুধিতপাষাণ এইসব সুপরিচিত গল্পকে রোমান্টিক ছোটগল্পরূপে উল্লেখ করা যায়। এদের বলতে পারি কবির প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্প। অন্যদিকে জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে নিতান্ত একালে রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্পগুলি লিখতে শুরু করেন তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি বিংশশতকের ছোটগল্পের লক্ষণ। এজন্যই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''আধুনিক গল্পগুলির আদর্শ ও রচনাপ্রণালী পূর্বতন গল্প হইতে অনেকটা বিভিন্ন. এই প্রভেধ দেখা গেছে প্রতমত বিষয় নির্বাচনে। 'তিনসঙ্গীর' ছোটগল্পগুলিতে দেখা যাচ্ছে নতুন সমাজভাবনা ও বিদ্রোহবিগে, নতুন যুগসমস্যা। সর্বোপরি বিষয় ও বিন্যাসে এক নতুন বুদ্ধিগ্রাহ্য ভঙ্গি। সেখানে যুক্তিতর্ক অনেক সময় হৃদয়ভাবকে আচ্ছন্ন করে বিরাজ করছে। দ্বিতীয়ত, ল(ণীয় আলোচ্য ছোটগল্পগুলিতে ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য। কথ্যভার নির্ভার পবাহ, শব্দপ্রয়োগে হীরাখচিত স্বর্ণের দ্যুতি বা অনেকসময় স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঝকঝকে কৃত্রিমতার জন্ম দিয়েছে এবং বাগবৈদগ্ধ বা Wit ও সাংকেতিকতার তির্যক রশ্মিছটা 'তিনসঙ্গীর' ছোটগল্পগুলির ভাষাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই পরবর্তী ছোটগল্পসমূহের মধ্যে ''নষ্টনীড়'', স্ত্রীরপত্র, ল্যাবরেটরী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বাংলাসাহিত্যে নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ''রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্বে লেখা ''তিনসঙ্গী'' গ্রন্থে (১৯৪০) যে তিনটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে— 'রবিরার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরি'— তাহারা তাঁহার অতিআধুনিক যুগের জীবনপরিস্থিতি ও ব্যক্তিত্বের সমাজ-নিরপেক্ষ অসাধারণত্বের প্রতি ঘনীভূত আকর্ষণের পরিচয় বহন করে।'' রবিবার গল্পে পাচ্ছি অভীক ও বিভার ব্যাহত প্রণয় সম্পর্কের বিশ্লেষণ রয়েছে। অভীক কুলাচারত্যাগী নাস্তিক আর বিভা ব্রাহ্মসমাজের আস্তিক্যবোধের মধ্যে লালিত মেয়ে। অভীর বিভাক প্রণয়ভিক্ষাকারী; বিভার প্রেম ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য প্রতিদানে অপারগ। পরস্পরের মধ্যে অনেক যুক্তিতর্কের আদানপ্রদান হয়েছে, অনেক তীক্ষণ মনন ও বুদ্ধির দীপ্তির প্রতিফলন দেখা গিয়েছে কিন্তু বিভা নিজের লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে। শেষ পর্যন্ত অভীক বিভার অলংকার চুরি করে শিল্পকলায় বিশেষজ্ঞের স্বীকৃতিলাভের জন্য বিলাতযাত্রা করেছে ও জাহাজ থেকে বিভাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ও নাস্তিকতা বর্জনের প্রতিশ্রুতি জানিয়েছে। অভীকের চরিত্র একরোখা, বেপরোয়া ও একান্তভাবে আত্মনির্ভর; শিল্পীর সৌন্দর্যতৃষ্ণা তাকে নারীর সঙ্গকামনায় ধাবিত করেছে কিন্তু এর ভিতর প্রকৃত প্রেমের নিবিড় মাধুরী ও নিষ্ঠা নেই। অভীক চরিত্রের গুণ যদি তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হয় তাহলেও বলতে হবে আত্মপ্রচারের উগ্রতা তার জীবন্ত মুখাবয়বকে অনেকটাই ঢেকে রেখেছে।

"শেষকথা"য় বিংশশতকীয় যুগলক্ষণের পাশাপাশি রোমান্টিকতার আংশিক লক্ষণ রয়েছে। এর নায়ক যুগচাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞানসাধনায় রত থাকলেও বনান্তরালবাসী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতি তার আকর্ষণ রোমান্টিক নায়কসুলভ। পূর্ব প্রণয়ীর দ্বারা প্রত্যাখাত অচীরা যে নতুন প্রেমের প্রতি বিমুখ নয় তা তার আচরণে বোঝা যায়। তবু উভয়ের মিলন ঘটেনি, কারণ এমন নয় যে নায়ক তার পূর্ব প্রেমিককে তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি বরং বিজ্ঞানসাধক প্রেমিক তার বিজ্ঞানসাধনা থেকে ভ্রষ্ট হতে চায়নি এটাই মূল কথা। শেষপর্যন্ত শেষের কবিতার অমিত-লাবণ্যর মতো অতিসূক্ষ্ম ভাবময় বিরহী প্রেমের সুরে এই প্রেমেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নায়িকা অধ্যাপক দাদামশাইকে নির্জনবাস থেকে লোকালয়ে ফিরেছে ও নায়ক বিজ্ঞানচর্চায় আবার মনোনিবেশ করেছে। চরিত্রসৃষ্টি বা ভাবুকতা নয়, নরনারীর প্রণয় আকর্ষণের মননদীপ্ত বিশ্লেষণেই ছোটগল্পটির প্রধান গৌরব।

তৃতীয় গল্প 'ল্যাবরেটরি'তে রয়েছে আরও সুতীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আচরণের অদ্ভুত খেয়ালিপনা। একালে ব্যক্তিত্ব যে কত নতুন নতুন রূপে ধারালো হয়ে উঠছে এবং পূর্বতন লৌকিক সংস্কার ও নীতিবোধকে হেলায় লঙ্ঘন করছে এখানে তারই প্রমাণ মেলে। নন্দকিশোর সোহিনীর পূর্বইতিহাস নিষ্কলঙ্ক নয় জেনেও তার চরিত্রের স্বকীয় তাগুণে তাকে জীবনসঙ্গিনী করেছে। বৈধব্যের পর সোহিনী তার স্বামীর অক্ষয়কীর্তি বিজ্ঞানমন্দিরের ভার যোগ্যপাত্রে অর্পণ তার জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করেছে। এক তরুণ বিজ্ঞানসাধক রেবতী ভারগ্রহণের উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব মেরুদণ্ডহীন। রেবতীকে আকর্ষণ করার জন্য একদিকে তার ভূতপূর্ব বিজ্ঞানশিক্ষক মন্মথ চৌধুরীর উৎসাহদান ও অপরদিকে সোহিনীর তরুণী কন্যা নীলার লোভনীয় সৌন্দর্যের আবেদনকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। নন্দকিশোর পুরস্কৃত হয়েছে সোহিনীর প্রেমনিবেদন ও চুম্বনদানে; কিন্তু নীলা তার মায়ের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করেছে। সে রেবতীর প্রতি ছলাকলাবিস্তার করে তাকে সাধনাভ্রষ্ট করেছে ও তাকে চটুল প্রণয়বিলাস এবং অসার খ্যাতির মোহে মাতিয়ে তুলেছে। তার উদ্দেশ্য তার পিতার ত্যক্ত সম্পদের কিছু অংশ বিজ্ঞানসাধনার গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে তার নিজস্ব ভোগবিলাসিতার চরিতার্থসাধন। সোহিনী রেবতীকে সরিয়ে দিয়ে ও নীলাকে তিরস্কার করে তার জীবনব্রতকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। নীলার বিত্তলোভ নিয়ে জানিয়েছে অভিযোগ, সে অসঙ্কোচে নিজের অসতীত্ব ঘোষণা ও নীলার পিতৃপরিচয়ে সন্দেহ আরোপ করেছে। এত কাণ্ডের পর সমস্ত সমস্যার অতি আকস্মিক ও হাস্যকর সমাধান ঘটেছে—রেবতী পিসিমার ডাকে তার অঞ্চলতলে আশ্রয় নিয়েছে।

"এই গল্পের প্রধান উৎকর্ষ সোহিনীর চরিত্র ও উহার মাধ্যমে নারীর সতীত্বের এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)। সতীত্ব ও পতিব্রতার ধর্ম রয়েছে দৈহিক শুচিতায় নয়, স্বামীর জীবনব্রত উদযাপনে অবিচলিত নিষ্ঠায়। অন্যপুরুষের কাছে আত্মদান, এমন কি মন্মথ চৌধুরীর সঙ্গে দাম্পত্যসম্পর্কের অভিনয়ও এর কাছে কিছু নয়। সোহিনীর এই চারিত্রিক স্বাতন্ত্র ফুটেছে কোনো দুঃসাহসিক কাজে নয়, মন্মথের সঙ্গে আলাপআলোচনায় দৃপ্ত, অসীম সাহসী মনোভাবের প্রকাশে। ল্যাবরেটরি নামক ছোটগল্পে সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে মনের যুক্তিবাদনির্ভর ও বুদ্ধিদীপ্ত পরিচয় পাই, অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের আবেগ প্রেরণার গতিময় রূপ পাই না। সোহিনী যেন ভবিষ্যতের নারী, পাশ থেকে দেখা তার মুখের ছবি যেন কয়েকটি ইঙ্গিত সংকেতের রেখায় ঈষৎ আভাসিত। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ও দেহমনের কোনো পরিচয় এখানে ফুটে ওঠেনি। মন্মথর সঙ্গে সংলাপে তার যে মানসউত্তেজনা ও ব্যক্তিত্বের গতিভঙ্গির ছাঁচটি পরিস্ফুট তারই আলোকে আমরা তাকে আংশিকভাবে দেখি। নীলার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, আছে শুধু মায়ের শাসন অসহিষ্ণু তরল উচ্ছৃঙ্খলতা। তার চঞ্চল মন মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল, কোনো স্থির সংকল্পের আশ্রয়ে দানা বাঁধেনি। এই অন্তিম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর প্রাক্তন চিত্রশালার অনবদ্য শিল্পসুন্দর মূর্তিগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে কতগুলি অসম্পূর্ণ টুকরো টুকরো রেখাচিত্রের

মধ্যে নিজ প্রতিভার নব নব পরীক্ষার অনিশ্চিত, অস্থির, আলোআঁধারি সা(র মুদ্রিত করেই যুগের অনিবার্য তাগিদ যথাসম্ভব মিটিয়েছেন— সমালোচকেরও মন্তব্য যথার্থ।

৩.২. ছোটগল্পের শিল্পতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাতের তিনসঙ্গী ঃ

প্রথমে ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রয়োজন। সেই সংজ্ঞার আলোকে 'তিনসঙ্গী'-র ছোটগল্প তিনটির বিশ্লেষণ তথা সমালোচনার একটা আরম্ভবিন্দু পাওয়া যেতে পারে। ছোটগল্পের রূপতত্ত্বের অন্যতম আদি নির্মাতা ব্র্যান্ডের ম্যাথুজ বলেছেন "The short story by its effect, a cettain unity of impression which set it apart from other kind of fiction."— মূলকথা ছোটগল্পে রয়েছে একটা প্রতীতীর সমগ্রতা— ছোটগল্পের পরিসমাপ্তিতে এর স্বাদ ছড়িয়ে পড়ে। (Philosophy of short story)। হাভানি ছোটগল্পের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করেছেন— "A short story myst contain one and only one informing idea and this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method." (An Introduction to the study of Literature)— ছোটগল্পে থাকবে মাত্র একটি ভাবের উন্মীলন অথবা প্রসার এবং সম্পূর্ণ একমুখী রীতির সাহায্যে এই ভাবটিকে তার যুক্তি(যুক্ত(উপসংহারে পৌঁছে দিতে হবে। স্যন ও ফাওলেইন (Sean O Faolain)-এর বক্তব্য "In other words the short story is an emphatically personal expositohn. What one searches for and what one enjoys in a story is a special distiliation, a unique sensibility which has recognised and selected at once a subject that, above all other subjects, is of value to the writer's temperament and to his alone—his counterpart, his perfect opportunity to project himself." (The short story)। ছোটগল্প বিশেষভাবে হচ্ছে ব্যক্তিজগতের প্রকাশ। ছোটগল্পে পাওয়া যায় এক বিশেষ নির্যাস এক মৌলিক অনুভূতি যা এমন একটি বিষয়কে বেছে নিয়েছে যেখানে প্রতিফলিত হয় লেখকের ব্যক্তিসত্তা।

সাহিত্যিক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ''সাহিত্যে ছোটগল্প গ্রন্থে ছোটগল্পের সংজ্ঞা গঠন করেছেন— "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতী (Impression) -জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্যসংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতালাভ করে।" বলাবাহুল্য এখানে লেখক ব্র্যান্ডের ম্যাথুজ কথিত 'Unity of Impression' প্রতীতীর সমগ্রতা বা ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। এই ঐক্যতত্ত্বের মূল উদ্‌গাতা এডগার অ্যালন পো। যা হোক আসল কথা ''প্রতীতীর সমগ্রতা বা Unity of Impression লেখকের প্রধান পালনীয় শর্ত।

অতঃপর উদ্ধৃত বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে ছোটগল্পের একটি বিধিপ্রধান বা শিল্পতত্ত্ব তৈরি করা যেতে পারে। প্রথমত, ছোটগল্পে ঘটনাগত, মনস্তত্ত্বগত বা চরিত্রগত একটিমাত্র সমস্যারই সংকটরূপ বা চূড়ান্তরূপ দেখানো হবে। দ্বিতীয়ত, বহমান জীবনের মধ্য থেকে লেখকের অনুভূতি একটি বিশিষ্ট প্রতীতীকে আহরণ করে নেবে। সেই প্রতীতী লেখকের মতের অনুকূল হতে পারে নাও হতে পারে। তৃতীয়ত, ছোটগল্প পড়ে আমরা পাব লেখকের ব্যক্তিত্বেরই একটা পরিস্রুত রূপ, গল্পের ভিতর দিয়ে লেখক তাঁর ব্যক্তিসত্তাকেই প্রতিফলিত করবেন। অতএব ছোটগল্প সম্বন্ধে শেষকথা হল তা হচ্ছে একমুখী— এখানে পাচ্ছি লেখকেরই ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ— লেখক তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন দ্বারা যে প্রতীতী আহরণ করবেন তারই রূপায়ন এখানে।

ছোটগল্পের এই শিল্পতত্ত্বের সাহায্যে তিনসঙ্গীর 'রবিরার', 'শেষকথা' ও 'ল্যবরেটরি' গল্প তিনটির কিছু উপলব্ধি সম্ভব। ছোটগল্পের যে প্রতীতীগত সমগ্রতা ও একমুখী ভাবের প্রাধান্য তা 'রবিবার' ছোটগল্পটি পড়লে খুঁজে নেয়া যায়।

একে বলতে পারি বিভা ও অভীকের মধ্যে প্রেমের মনস্তত্বগত সংঘাতবা বাইরে আস্তিক ও নাস্তিকের দ্বন্দ্বের রূপ নিয়েছে। একে নামান্তরে বলতে পারি পুরুষের বোহেমিয়ান শিল্পীজীবন ও কল্যাণীনারীর আদর্শরঞ্জিত জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত। বিদায়কালে নায়ক অভীকের মনে এই দ্বন্দ্বের নিরসনের ও একটি ভাবগত মিলনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বা আভাসও দেখা যাচ্ছে। তার প্রায় সমাপ্তি-সংলাপটি স্মরণ করি— ''এ কথা সত্য মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসা আমাকে কৃতজ্ঞ করে। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান যে, তারা নিহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। তারা আভাস তুমি সত্য। .....তোমাকে পাইনন বলে অনেক খুঁতখুঁত করেছি কিন্তু হৃদয়ের দানে তুমি যে কৃপণ, এ কথার মতো বড় অবিচার আর কিছু হতে পারে না। আসলে এ জীবনে তোমার কাছে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারল না। হয়তো কখনো হতে পারবে না। এই তীব্র অতৃপ্তি আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। .....তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার ভালোবাসা জানাওনি কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে যা তুমি দান করেছ, নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারেনি— বলেছে, অলৌকিক। এরই আকর্ষণে কোনো একভাবে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি। ঠিক জানিনে। হয়তো সবই বানানো কথা। কিন্তু হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে, সেখানে প্রবল ঘা লাগলে কথা আপিন বানিয়ে বানিয়ে ওঠে, হয়তো সে এমন কোনো সত্য যা এতদিনে নিজে বানাতে পারিনি।''

'রবিবার' ছোটগল্পে ঘটনাগত, চরিত্রগত, মনস্তত্বগত একমুখীনতার অভাব নেই। আসলে ছোটগল্প স্বভাবতই স্বল্পআয়তন এখানে উপন্যাসের মতো প্লট বা কাহিনীর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করার মতো সুযোগ নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই 'শেষ কথা' গল্পটি থেকে একটি লাগসই মন্তব্য উদ্ধৃত করছি— ''ছোটগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটাকে ফলিয়ে বলবার লোভ করব না, ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাই নে।'' অতএব স্বয়ং ছোটগল্পকারের মতে, এখানে ফলিয়ে বলার সবিস্তার বলার অবকাশ নেই। বস্তুত 'রবিবার' ছোটগল্পটি বহির্ঘটনা সামান্যই যা কিছু ঘটছে সব ভিতরেই— অন্তর্ঘটনা তার স্থান নায়ক অভীক ও নায়িকা রুচিবার মনে। একটু উদাহরণ দিচ্ছি Text বা পাঠ্যাংশ থেকে— ''বিভাকে থামিয়ে দিয়ে অভীক বললে, 'অভাব আছে আমার, দারুণ অভাব। তোমার হাতেই রয়েছে সুযোগ, তা পূরণ করবার। কী হবে টাকায়'

বিভা অভীকের হাতের উপরে স্নিগ্ধবাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'যা পারিনে তার দুঃখ রইল আমার মনে চিরদিন। যতটুকু পারি তার সুখ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে।'' এখানে ঘটনাগত আলোড়ন যা কিছু সবই নায়ক নায়িকার মনোগহনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং তার মধ্যে রয়েছে একক অনুভূতির তীব্রতা।

এই একরোখা অনুভূতির সঙ্গেই জড়িত মনস্তত্ত্বের বাহুল্যবর্জিত অথচ গভীর বিন্যাস। রবিবার ছোটগল্পে রয়েছে প্রেমমনস্তত্ত্বের এক আশ্চর্য ইঙ্গিত। অভীকের প্রতি বিভার উক্তি, ''কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলো, তোমার কাছে আশকারা পেয়ে রাজ্যের যত মেয়ে তোমাকে নিয়ে এই যে টানাটানি করে এতে কী তোমার ভালোলাগার ধার ভোঁতা হয়ে যায় না। তোমরা কথায় কথায় যাকে বল thrill ঠেলাঠেলিতে তাকে কি পায়ের নীচে দলে ফেলা হয় না।'' এবং পাশাপাশি স্থাপন করেছি বিভার প্রতি অভীকের উক্তি— ''আমার এই দুঃখু যে আমার ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পারনি। যদি পারতে তা হলে তোমার সব ধর্মকর্মের বাঁধন ছিঁড়ে আমার সঙ্গিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতেও কোনো বাঁধা মানতে না, তরী তীরে এসে পৌঁছয় তবু যাত্রী তীর্থে ওঠবার ঘাট খুঁজে পায় না আমার হয়েছে সেই দশা। বী, আমার মধুকরী কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে বলো।'' দুটি সংলাপ পরীক্ষা করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ নায়কনায়িকার মনস্তাত্ত্বিক ভাবসংঘাত সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, 'রবিবার' ছোটগল্পে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছেন তা স্বভাবতই সংহত, স্বল্পআয়তনে পরিবেশিত।

এবার আলোচ্য সমগ্রতা সংক্ষিপত্তার ভিত্তিতে 'শেষকথা' ছোটগল্পটির বিচার করছি। এখানে অচিরা ও গল্পকথকের প্রেমের মধ্যে যে মহৎ উত্তরণ বা Sublimation এর সঞ্চার ঘটেছে, উভয়তসঙ্গতিমূলক যে বিচ্ছেদবেদনার আভাস দেখা গেছে তাকে বিলতে পারি গল্পটির মূল প্রতীতী। অচিরার প্রেমের উত্তরণ বা Sublimation ঘটল, তার ভালোবাসার মধ্যে আদর্শবাদের সঞ্চার হল যখন সে নবীনের বিজ্ঞানসাধনায় মুগ্ধ হয়েও তারপর সিদ্ধান্ত নিল সে যেন নারীর মোহজাল বিস্তার করে এই বিজ্ঞানসাধকের সাধনাকে বিঘ্নিত করেছে। ''আমার ঐ পঞ্চবটির মধ্যে বসে আপনার অগোচরের কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেননি প্রখর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয়নি কারো সঙ্গের। এক একদিন মনে হয়েছে তহাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবে নিশ্চিত করেছিলেন সেটা পাননি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন করে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলছে, এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনো দেখেনি। দূর থেকে ভক্তি করেছি।''

এবং পুনশ্চ ''আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাঁধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে।''

অতএব অচিরার মধ্যে একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি প্রেমের মুগ্ধতা ও আত্মসংবরণ। এবার নবীন মাধবের কথা বলি। ''সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙ্গনার গাঁটছেড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটি ডায়েরির খাতা নিয়ে। এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেলোএকটি অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্ণিমার বান ডেকে আনার মতো ব্রহ্মতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ।'' এবং পুনশ্চ একেবারে গল্পের সমাপ্তিতে ''বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল— বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল— খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।''

অচিরা ও নবীনমাধবের উক্তিগুলি পরীক্ষা করে বলা যায় 'শেষ কথা' গল্পের Unity of Impression বা প্রতীতীগত ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছে প্রেমের উত্তরণ ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রেমের বিচ্ছেদবেদনাকে ঘিরে। অন্যদিকে ঘটনাগত সংক্ষিপ্তি যদি পরীক্ষা করতে যাই তাহলে দেখি রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের গল্পের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ''রবিবার'' গল্পটিতে মাত্র একটি দুটি ঘটনাকে বেছে নেয়া হয়েছে এবং এখানেও মানবমানবীর মনের মধ্যেই যা কিছু আলোড়ন উঠেছে। বিদেশ প্রত্যাগত এক উচ্চশিক্ষিত তরুণ ভূত্তাত্ত্বিক, শাল-মহুয়া অধ্যুষিত নির্জন প্রকৃতিপরিবেশ, গাছের পাশে বসে থাকা একটি ডায়েরিলিখনরত মেয়ে, আত্মভোলা প্রধান ভূতপূর্ব বিজ্ঞানের অধ্যাপক এদের ঘিরেই গাঢ় সংক্ষিপ্ত ঘটনাবস্তুর অবতারণা। নায়কের জীবনকথা ও মেয়েটির পূর্ব ইতিহাস লেখনীর একটি দুটি আঁচড়েই বর্ণিত। নায়কের আত্মকথনের ভিতর দিয়েই মূল ঘটনাবস্তুর ইঙ্গিত পাচ্ছি— ''জিয়লজির চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এই আরণ্যক মায়ার কাজ চলছিল, খুঁজছিলুম রেডিয়মের কণা, যদি কৃপণ পাথরের মুঠির মধ্য থেকে বার করে যায়(দেখতে পেলুম অচিরাকে কুসুমিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে।'' বিজনে এই বনদেবীর মতো নারীর আবির্ভাব নিশ্চয়ই এক অপরূপ সংঘটন। আবার গল্পকথকের (protagonist) বর্ণনায় ফিরে যাচ্ছি— ''অচিরা উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হটে গেলুম। অচিরা বললে, 'সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এইখানেই শেষ বিদায় নিলুম। যাবার আগে

আর কিন্তু দেখা হবে না"। ঘটনা হিসেবে সংক্ষিপ্ত অথবা সামান্য কিন্তু এর অনুকম্পন অথবা ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী।

'শেষ কথা' গল্পটির মনস্তত্ত্ব হচ্ছে নারীর সঙ্গে পুরুষের এবং পুরুষের সঙ্গে নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে অনীহা—এই ব্যাপারটিকে একটি কাব্যিক বিচ্ছেদ বেদনার-সুবর্ণমুখোশ পরানো হয়েছে। এখানেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছোটগল্পের শিল্পধর্ম অনুযায়ী একটি দুটি রেখা ও বিরলবর্ণে আঁকা। "ভেবেছিলুম সেই আমার সত্যকার স্বভাব, তার আচরণের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে আমি হলপ করতে পারতুম। কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধি শাসনের বহির্ভূত যে—একটা মূঢ় লুকিয়ে ছিল, তাকে এই প্রথম দেখা গেল। ধরা পড়ে গেল আরণ্যক, যে যুক্তি মানে না, যে মোহ মানে। বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্রধ্বনি। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে তার উদাত্ত সুর, রাতে দুপুরে মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি, গুঞ্জন জীব-চেতনায়, আদিম প্রাণের গূঢ় প্রেরণায় বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।" নায়কের জবানিতে এই হল পুরুষ মনস্তত্ত্বের সংহত রূপরেখা—পুরুষের চেতনায় প্রেমের আদিম পদধ্বনির রণনঝণন। অচিরাও তার প্রণয় আবির্ভাবের জৈবমূলটিকে দেখতে পেয়েছে, মনের নিহিত পাতালে সে-ও ডুব দিয়েছিল। সাক্ষ্য হিসেবে উদ্ধৃত করছি তার উক্তি—"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে'। তাঁর ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ মানবমনস্তত্ত্বের নিপুণ রূপকার এবং শেষদিকের ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রাখর্য লাভ করেছিল।

তিনসঙ্গীর গল্প তিনটির মধ্যে 'ল্যাবরেটরি'ই বিখ্যাততম। 'সোহিনী' চরিত্রের শক্তিমত্তা ঘিরেই গল্পটি আবর্তিত, নারীর স্বাধীন সত্তার জয়ঘোষণা ও সমাজের উপর তার আধিপত্য বিস্তারের আভাসকেই গল্পটির মূল প্রতীতী (Unity of Impression) বলা যায়। পাশাপাশি রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বিস্তার ও ঘটনাগত ঐক্য। নারীবিদ্রোহিনী সোহিনীর সমস্ত সত্তা আলোকিত হয়ে উঠেছে তারই একটি সংলাপে—"মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাঁধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরী মশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে, কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি। কিন্তু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।'

'ল্যাবরেটরি' ছোটগল্পের ঘটনাবস্তু সোহিনী ছাড়া অধ্যাপক চৌধুরী, রেবতী ও নীলাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। 'ল্যাবরেটরি' বড় গল্প, মোট ২৭ পাতা—রবীন্দ্র ঘটনাবস্তুর ব্যবহারে বাহুল্যবর্জিত পরিমিতির পরিচয় দিয়েছেন। এই গল্পটির প্রধান আবেদন মনস্তাত্ত্বিক ঘাতপ্রতিঘাতময় আবহরচনায়। সোহিনী ও তার মেয়ে নীলার ব্যক্তিত্বের সংঘাত মনস্তাত্ত্বিক লিপিকুশলতার সঙ্গে বর্ণিত অন্যদিকে অধ্যাপক চৌধুরী ও সোহিনীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের সূক্ষ্ম সঞ্চার। "নীলা মাকে বললে, 'আমাকে আর কতদিন তোমার আচলের গাঁট দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।" নীলা ও তার মা সোহিনীর ব্যক্তিত্বের সংঘাত যা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ফুটে উঠছে তা আলোচ্য ছোটগল্পের প্রধান আকর্ষণ। এ সংঘাত মূলত মনস্তাত্ত্বিক। আবার সোহিনীর সঙ্গে অধ্যাপকের সম্পর্কে একটা প্রায় প্লেটোনিক দেহ-সম্পর্ক বর্জিত-প্রেমের ইঙ্গিত আছে। "আশ্চর্যের কথা এই সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে, কিছু মনে করবেন না।' জড়িয়ে ধরলে চৌধুরীর গলা। বললে, সংসারে কোনো বন্ধনই টেঁকে না, এও মুহূর্ত কালের জন্যে'। বলেই গলা ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে পড়ে সোহিনী অধ্যাপককে প্রণাম করলে।" সোহিনীর মতো নারী পুরুষকে অবলম্বন না করে বাঁচতে পারে না—এদিকেই কাহিনীতে ইঙ্গিত আছে।

ছোটগল্পকে গীতিকবিতার সহেগ তুলনা দেয়া হয়েছে। সে শুধু এর উপন্যাসের তুলনায় স্বল্পআয়তন ও নিটোল একমুখী বিস্তারের জন্য নয়। ছোটগল্পের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিসত্তা ও জীবনদর্শনের জন্যও এই তুলনার আরোপ। গীতি কবিতায় তাকে লেখকের আত্মমুখীনতা, ছোটগল্পেও রয়েছে লেখকের ব্যক্তিধর্মের প্রকাশ, একে বলতে পারি পরোক্ষ আত্মমুখিনতা। শিল্পতত্ত্বের দিক থেকে বলা যায় তিনসঙ্গীতে রবীন্দ্রীয় ব্যক্তিধর্ম ও জীবনদর্শনের। কিছু প্রকাশ রয়েছে। দৃষ্ঠাত দেয়ার জন্য চলে যাই 'রবিবার' নামক ছোটগল্পের জগতে। ''সত্যি কথাই বলি তবে, 'বী', যাকে বলে thrill, যাকে বলে ecstasy, সে হল পয়লা নম্বরের জিনিস, ভাগ্যে দৈবাৎ মেলে। কিন্তু তুমি যাকে বলছ ভিড়ের মধ্যে টানাটানি, সে হল সেকেন্ডহ্যান্ড দোকানের মাল, কোথাও বা দাগী, কোথাও বা ছেঁড়া, কিন্তু বাজারে সেও বিকোবে অল্প দামে। সেরা জিনিসের পুরো দাম দিতে পারে কজন ধনী।''

অথবা ''দেখো বী, তুমি প্রচন ন্যাশনালিস্ট। ভারতবর্ষে ঐক্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতোই নাস্তিকের। আমিই ভারতবর্ষের প্রাণকর্তা।'' দুটিই অভীকের উক্তি, 'বী' হচ্ছে বিভা। দুটি সংলাপের মধ্যেই বিভিন্ন আত্মধর্মী প্রবন্ধে (Personal Essay) ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। নির্লিপ্ত নিরাসক্ত জীবনদর্শন ও ন্যাশালিজম বা জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে মানবতাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

এবার যাচ্ছি 'শেষকথা' নামক ছোটগল্পে। ''কচ ও দেবযানী'' বলে একটা কবিতা আছে। তাতে ঐ কথাই আছে, মেয়েদের ব্রত হচ্ছে পুরুষদের বাঁধা, আর পুরুষদের ব্রত সে বাঁধন কাটিয়ে অমরলোকের রাস্তা বানানো।''

অথবা ''হঠাৎ মনে খুব একটা আনন্দ জাগল—বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।''

প্রথম উদ্ধৃতিটি অচিরার প্রতি গল্পকথক নবীনের উক্তি। 'কচ ও দেবযানী' কবিতাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই লেখার দিকে উল্লেখ করেছে—কবিতাটির নাম 'বিদায় অভিশাপ', কচ ও দেবযানী নায়ক-নায়িকা। যা হোক 'রবিবার' গল্পের উপসংহারে একটা যেন কচ ও দেবযানী-র বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী পুরুষকে মমতার ডোরে বাঁধে আর পুরুষ তাকে পদে পদে মোচন করে জীবনের পথে এগিয়ে যায়—রবীন্দ্রনাথ একথা বহু জায়গায় বহুভাবে বলেছেন। এ তার প্রিয় বিষয়। চতুরঙ্গ উপন্যাসের নায়ক শচীশকেও কারো কারো মনে পড়তে পারে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি নায়কের স্বগত উক্তি। রবীন্দ্র-দার্শনিকতায় আগাগোড়া নিষিক্ত কথাগুলি, ''ছিন্নশিকল পায়ে নিয়ে ওড়ে পাখি'—রবীন্দ্রনাথেরই একটি গানের অনুরণন যেন আবহে আসছে মনে হয়।

এবার সর্বশেষে 'ল্যাবরেটরি' ছোটগল্পে লেখকের ব্যক্তিধর্মের অনুসন্ধান করা যাক। তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচবার শখ মেটাবার জন্যে এমন বিন্দুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে বেশি।''

এবং পুনশ্চ

''যাদের চোখ আছে তারা দেখেছে, মহাকালের চেলারা এইখানে আসে তাণ্ডবনৃত্য করতে।''

প্রথম উক্তিটি অধ্যাপকের প্রতি সোহিনী, সোহিনী তার স্বামী নন্দকিশোরের কথা বলছে। মানুষকে অমরত্বলাভের জন্য নিজের চেয়ে বড় কিছুকে গ্রহণ করতে হয়, নিজেকে ছাপিয়ে যেতে হয় বিজ্ঞানগবেষকের জবানিতে রবীন্দ্রনাথেরই অভ্রান্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। যারা রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন, সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ পড়েছে তারা মুহূর্মুহূ এমন বক্তব্যের মুখোমুখি হয়েছে।

দ্বিতীয় উক্তিটি অধ্যাপকের রেবতীর প্রতি, শান্ত নির্বিরোধীদের দিয়ে পৃথিবীতে কিছু হয় না, এর জন্য চাই অশান্ত বাঁধাপথের বাইরে যারা যায় তাদের— রবীন্দ্রনাথের এ একটা প্রিয় বাক্য বা জীবনদর্শন। বলাকা কাব্যের 'সবুজের অভিযান', কল্পনাকাব্যের 'হতভাগ্যের গান', 'তাসের দেশ' এসব সাহিত্যকর্মের কথা মনে পড়বে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে লেখকের আত্মের প্রক্ষেপ অবশ্যই রয়েছে। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, ছোটগল্পের শিল্পে নৈর্ব্যক্তিকতার প্রশ্নও জরুরি। চরিত্র, ঘটনা, মনস্তত্ব, দ্বন্দ্বসংঘাত সবকিছু সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে লেখককে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তার সৃষ্টিকে আপন আবেগে চলতে দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে রূপকারের এই নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অভীক, বিভা, অচিরা, নবীনমাধব, সোহিনী, নীলা, রেবতী, অধ্যাপক ইত্যাদি চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তারা তাদের স্বাধীন প্রাণাবেগেই এগিয়ে চলেছে আপন পরিণতির দিকে। আর একথা কথা ছোটগল্পের আত্মধর্মিতা শুধু লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিফলন থেকেই আসে না, এই আত্মগত ভঙ্গি আসে নায়ক ও নায়িকা চরিত্রের নিজস্ব আত্মউদঘাটন ও আত্মঅবতরণ থেকে। অভীক বা বিভা, অচিরা বা নবীন, সোহিনী প্রত্যেকেই তন্ন তন্ন করে নিজের সত্তা বা আত্মকে পরীক্ষা করে দেখেছে— নিজেদের মূল প্রবণতাগুলোকে খুঁজবার চেষ্টা করেছে, চরিত্র হিসেবে আত্মমুখিনতার শিখরে আরোহণ করেছে। এ ভাবেই তিনসঙ্গীর ছোটগল্পগুলির লিরিক আবেদন অনেকসময় গড়ে উঠেছে।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা শিল্পতত্ত্বের নিরিখে তিনসঙ্গীর আলোচনা করলাম। এবার করছি তিনসঙ্গীর বিভিন্ন গল্পের পাঠবিশ্লেষণ।

৩.২.১ তিনসঙ্গীর বিভিন্ন গল্পের পাঠবিশ্লেষণ ঃ ছোটগল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অবয়বের সংক্ষিপ্ততা— সমালোচকের ভাষায় তা তন্নঙ্গী— "Slightness" ও Steekness" ছোটগল্পকে জনপ্রিয় করছে। অন্যদিকে ছোটগল্পে গল্প থেকে গল্পান্তরে রয়েছে তুমুল বৈচিত্রী। উনিশ শতকীয় ছোটগল্প মূলত রোমান্টিক ও ব্যক্তিধর্মী— "the short story as an essentially romantic form" রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলিকে এভাবেই চিহ্নিত করা যায়। অতিথি, কঙ্কাল, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিতপাষাণ, নিশীথে, মুক্তির উপায়, মেঘ ও রৌদ্র, গুপ্তধন প্রভৃতি গল্পগুলিতে কল্পনার প্রাধান্য, বাস্তবতার গৌণভূমিকা, আকস্মিকতার অবতারণা, ভাষার 'লিরিকিজন্ম' বা কাব্যধর্মী মানুষ তাদের সম্পর্কে রোমান্টিক ছোটগল্প এবং প্রথম শ্রেণীর রোমান্টিক ছোটগল্প— এই বিশেষণই ব্যবহার করবে।

পাশাপাশি 'তিনসঙ্গী'র ছোটগল্পগুলিকে তুলনা করলে আমরা তাদের ভিতর Realism ও Naturelism এককথায় বাস্তবতা ও কল্পনাসমৃদ্ধ বাস্তবতার শিল্পসম্মত ব্যবহার লক্ষ করব। রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরীকে এজন্যই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে যে এদের মধ্যে নুতন পথের সূচনা দেখা গিয়েছে। বলা যায় নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি গল্পগুলির ভিতর দিয়ে বাংলা ছোটগল্পে আধুনিকতার সূচনা ও প্রাথমিক বিবর্তন দেখা গিয়েছিল। তিনসঙ্গীর আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যবর্তী বাস্তবতা, মনস্তত্ব বিশ্লেষণ, পরিবেশ ও আবহরচনায় খুঁটিনাটি-র দিকে নজর বা detail এর কাজ লক্ষ করবার মতো। গল্পকে ছাপিয়ে যাচ্ছে চরিতেরর আবেদন, ভাষার কাহিনী ও ঘটনার মধ্যে ফুটে উঠছে খণ্ডতা ও আংশিকতার লক্ষণ। ই. এম ফর্স্টার উপন্যাস প্রসঙ্গে plot এর যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন যে প্লট হচ্ছে Story with a causality — কাহিনীর ভিতর থাকবে কার্যকারণ, অর্থাৎ আকস্মিকতা ও বিস্ময়ানেক নয় বরং বাস্তবতার প্রতিই হবে ছোটগল্পের আনুগত্য বা 'তিনসঙ্গী' প্রসঙ্গে খুবই প্রযোজ্য। বলাবাহুল্য এ সবই হচ্ছে বিংশশতকীয় ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।

'রবিবার' ও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পালাবদল

'রবিবার' ছোটগল্পটিতে যেন 'শেষের কবিতার দূরাগত প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অভীকের মধ্যে রয়েছে ঝকঝকে

বুদ্ধির দীপ্তি, এই গতানুগতিকাতর দেশে সে যেন নিয়ে এসেছে রোমান্টিক বিদ্রোহের এক ঝলক টাটকা হাওয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্র অনেক সময় ফুটিয়ে তোলেন সেই চরিত্রের চেহারার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে। গল্পের শুরুতেই পাচ্ছি নায়কের বর্ণনা— ''অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ, গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। স্বভাবে তার ছিল নাস্তিকতা। শেষ পর্যন্ত পিতার সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের সংঘাত বাধে কঠোর ক্রিনয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সন্তান অম্বিকাচরণ পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন।

''ছেলে মাকে গিয়ে বললেন, মা দেবতাকে অনেককাল ছেড়েছি এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাত বাহুল্য। কিন্তু জানি বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই। ঐখানে কোনো দেবতার দেবতাগিরি খাটে না, তা মত বড় জাগ্রত হোন না তিনি।''

''মা চোখের জল মুছতে মুছতে আঁচল থেকে খুলে ওকে একখানি নোট দিতে গেলেন। ও বললে, 'ঐ নোটখানায় যখন আমার অত্যন্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই তোমার হাত থেকে নেব। অলক্ষীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঙ্কনোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।''— এভাবেই রবীন্দ্রনাথ 'রবিবার' গল্পটির সুচনা করলেন, নায়কের মুখের কণায় তার নতুন যুগের ছোটগল্পের ভাষা বৈশিষ্ট্য সহজেই ফুটে উঠেছে। এ ভাষা, হালকা ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত, প্যারাডক্স-প্রধান অর্থাৎ বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে আপাতবিরোধ—এভাবেই রবীন্দ্রনাথ 'রবিবার' গল্পটির সূচনা করলেন, নায়কের মুখের কথায় তার নতুন যুগের ছোটগল্পের ভাষা বৈশিষ্ট্য সহজেই ফুটে উঠেছে। এ ভাষা, হালকা ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত, প্যারাডক্স-প্রধান অর্থাৎ বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে আপাতবিরোধ— মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে অর্থ বোঝা যায়। 'দেবতাকে অনেককাল ছেড়েছি, এমন অবৱায় আমার দেবতাকে ছাড়াটা নেহাত বাহুল্য' অথবা 'অলক্ষীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঙ্কনোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।''— এ সব সংলাপে এপিগ্রামের আদল ফুটেছে। এপিগ্রাম অর্থাৎ 'an apparent contradiction in statement''—মননের ব্যবহারে বক্তব্যের আপাত বিরোধের অবসান হয় ও অর্থ বোঝা যায়।

অভীককুমারের মধ্যে ছিল বহুমুখী প্রবণতা। ''জীবনে ওর দুটি উলটো জাতের শখ ছিল, এক কলকারখানায় জোড়াতাড়া দেয়া, আর এক ছবি আঁকা।'' মোটরের কারখানায় ও শখ করে মেকানিক আবার তুলি হাতে ওর বাঙালি টিশিয়ান হওয়ার সাধনা। অভীক সরকারি আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল। ''ও আর্টিস্ট, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জোর আওয়াজে।'' প্রদর্শনী বের করলে ছবির কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরল আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান। ও যতই গর্জন করে বললে, 'আমি আর্টিস্ট', ততই তাঁর প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল একদল লোকের ফাঁকা মনের গুহায়, তারা অভিভূত হয়ে গেল। শিষ্য এবং তার মেয়ে বেশি সংখ্যক শিষ্য জমল ওর পরিমণ্ডলীতে।'' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য টিশিয়ান হচ্ছেন রেনেশাঁস যুগের বিখ্যাত ইতালিয়ান আর্টিস্ট, ভেনাসের একাধিক বিখ্যাত নগ্নিকাচিত্র তিনি এঁকেছেন।

পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তার ভক্তসংখ্যা কমে গেল কারণ অর্থকুলীন্য তখন তার ছিল না। কিন্তু নারী ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যাহ্রাস ঘটল না। ''উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে উচ্চমধুর কণ্ঠে তাকে বলেছে আর্টিস্ট।'' অজ্ঞাতবাসে নানা জীবিকায় কাল কাটিয়ে বোহেমিয়ান আর্টিস্টরূপে নায়কের আত্মপ্রকাশ। ''চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বে-আব্রু রীতিতে যে-সব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ আলোচনা করতে লাগল ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে।'' এখানে একদিকে আছে 'বে-আব্রু' আধুনিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ খোঁচা অন্যদিকে শিল্পী অভীককুমার যে নগ্ন মডেল অবলম্বনে নগ্নচিত্রঅঙ্কনে পারদর্শী তারও আভাস। বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের কবিতায় যেন অবচেতনার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে, অবদমিত ইচ্ছাপূরণ হয়েছে শিল্পের মাধ্যমে, তাঁর শেষদিকের ছোটগল্পেও অবচেতনার ডানাধ্বনি, এক বলিষ্ঠ সাহসিকতার পরিচয়। রবিবার, ল্যাবরেটরি প্রভৃতি গল্পে সে জাতীয় ছাপ আছে।

ছোটগল্পের রোমান্টিক মূল অথবা জন্মউৎস সম্বন্ধে সমালোচকেরা অবহিত আছেন। "Romanticism war one of the main forces propelling the nineteenth century short story", "...in its nineteenth century development the short story normally incorporated such Romantic features as the singling out of a significant moment of awareness"—উনিশ শতকের ছোটগল্পে রোমান্টিসিজমই ছিল মূল চালিকাশক্তি, একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তকে যে গুরুত্ব দিয়েছে যা হচ্ছে রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য (দ্রষ্টব্য Ian Reid : The short story)। খ্যাতিসমালোচক একথা বলার পরও সতর্কবানী উচ্চারণ করেছেন, ছোটগল্পের এই একমাত্র অথবা অপরিহার্য প্রবণতা নয়।

ছোটগল্পের যে ভিন্নতর লাক্ষণিক বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা থাকতে পারে, রোমান্টিক আদলের ভিতর থেকেও যে সেই আদল ভাঙার দিকে সে এগিয়ে যেতে পারে তার উদাহরণ 'তিনসঙ্গী'র ছোটগল্পে পাই। 'রবিবার' ছোটগল্পে অভীক ও বিভার প্রেমে রোমান্টিকতার আদল আছে, ভাষার হালকা ভাবুকতায় রয়েছে তারই বহিরঙ্গ। বিভার রূপবর্ণনা মনে করছি। "কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শুরু। .....বিভার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়। কেমন করে মন টানে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না।" ওর সম্বন্ধে অভীক একদিন বলেছিল, "কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের; লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গে মেলে, ইনস্ক্রুটেবল"। ইনস্ক্রুটেবল অর্থাৎ রহস্যময়। লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি (লিওনার্দো দা ভিঞ্চি) বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর 'মোনালিসা' নামক জগৎ বিখ্যাত চিত্রের স্রষ্টা।

এই নায়িকা বিভা কিন্তু অভীকের ছবির আধুনিকতা বুঝতে পারেনি। "এই ছবির ব্যাপারে দুজনের মধ্যে একটা তীব্র দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি বুঝতেই পারত না সে কথা সত্যি। .....কিন্তু তীব্র ক্ষোভে ছটফট করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোক ওর ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করছে, বিভাও যে মনে মনে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহ্য। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও ইউরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।"

অতএব দেখতে পাচ্ছি 'রবিবার' ছোটগল্পে রয়েছে নায়কনায়িকার চরিত্রের মধ্যে আবেগগত সংঘাত। এই সংঘাতের রূপায়ন অথবা বুননে রবীন্দ্রনাথ মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন এবং এখানেই এসেছে গল্পের আধুনিকতা। বিভার জীবনে তার বাবার প্রভাব ছিল। অভীকের অভিযোগ বিভা পড়াশোনা করেছে, বাইরে থেকে মনে হয়, তার বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে কিন্তু তবু সে আস্তিক তবু সে ভগবানে বিশ্বাস করে। অভীক তার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বিভাকে বলেছিল—'তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস কর আমি তাকে করি নে বুদ্ধি আছে বলে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই, তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস কর না কেন। তুমি ত নাস্তিকের জাত মারতে পার না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে। সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যে একটি দেবতাও নেই আমার সামনে"। স্পষ্ট বুঝতে পারি অভীকের মনে রয়েছে বিভার সঙ্গে তুলনায় একটা শ্রেষ্ঠত্ববোধ; সে নাস্তিক এটাও তার গর্বের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ রবিবার ছোটগল্পে যে মনস্তাত্ত্বিক আবহ সৃষ্টি করেছেন তা বোঝানোর জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য উদ্ধার করছি। "মায়ের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে বাধা পেয়ে বাপের উপরে বিভার নির্ভর আরো গভীর এবং মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।" এবং বিভার প্রতি অভীকের সংলাপ "যাকে তুমি কষ্ট দিতে চাও না, তিনি তো নেই, আর কষ্ট যাকে নিষ্ঠুরভাবে বাজে, সেই লোকটাই আছে বেঁচে। হাওয়ায় তুমি ছুরি মারতে ব্যাথা পাও, আর দরদ নেই এই রক্তমাংসের বুকের উপরে।"

অতএব বুঝতে পারি পিতৃমাতৃহীন বিভার জীবনে কীভাবে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। তার ও অভীকের

স্বাভাবিক সহজ সম্পর্কের মধ্যে তার পিতৃভক্তি একটা অদৃশ্য দেয়ালের সৃষ্টি করেছে। পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষা ও সংস্কারকে সে যদি বুদ্ধিদীপ্তভাবে সংশোধিত করে নিতে পারে তাহলেই তার নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু বিভা পিতার অবর্তমানেও পিতৃবিদ্রোহিনী হতে পারেনি। মানসিকভাবেও তার পক্ষে তার সত্তার ভিতরে অবস্থিত ছায়াপিতাকে হত্যা করা সম্ভব ছিল না। একেই বলা যায় ফ্রয়েডীর ভাষ্য অনুযায়ী ইলেকট্রা কমপ্লেক্স (Electra Complex) অর্থাৎ নারীর ক্ষেত্রে পিতৃপ্রেমের তত্ত্ব। অভীক কিন্তু পিতৃবিদ্রোহী হতে পেরেছিল, মায়ের স্নেহপ্রভাবকে ছিন্ন করা ও পিতার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা তার কাছে ছিল আপন ব্যক্তিত্বকে স্বপ্রতিষ্ঠ করার উপায়। অতএব ফ্রয়েডীর মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব ব্যবহার করে তাঁর 'সাইকো-অ্যানালিসিস' বা মনোসমীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে আমরা রবিবার ছোটগল্পটির নায়ক অভীক ও নায়িকা বিভার মনোগহনের রহস্য বুঝতে পারি অথবা চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারি।

"While he is still a small child, a son will aready begin to develop a special affection for his mother, whom he regards as belonging to him, he begins to feel his father as a rival who desputes his sole possession. and in the same way a little girl looks on her mother as a person who interers with her affectionate relation to her fatehr and who occupies a position which she herself could very well fill." (Sigmund Freud : Introductory lectures on Psycho-analysis)। পুত্র মাকে ভালোবাসে এবং পিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, কন্যাসন্তান পিতাকে ভালোবাসে এবং মাতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ব্যক্তিত্বের বিকাশে একটা সময়ে কিন্তু এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের নিরসন করে নিতে হয়। বিভা খুব সাফল্যের সঙ্গে এটা পারিনি, তাই প্রেমের ক্ষেত্রে তার জীবনবিকাশ কিছুটা যেন কুণ্ঠিত ও ব্যাহত।

অভীকের অপরাপর প্রেমিকারা পুরুষের মধ্যে খোঁজে ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য অর্থাৎ বহুসম্পদ। কিন্তু বিভা বলে অর্থবিত্তকে যারা ঐশ্বর্য বলে জানে তারা পুরুষকে ছোটো করার দিকে টানে। অভীক জানে এই অনন্য নায়িকা যাকে ঐশ্বর্য বলে জানে ইচ্ছে করলে তারই সর্বোচ্চ চুড়ায় নায়ককে পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু তারই মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াল ভগবান। বিভা বলে বিয়ে আর্টিস্টের পক্ষে বন্ধন, প্রেরণাকে সে নষ্ট দিতে পারত। কিন্তু তারই মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াল ভগবান। বিভা বলে বিয়ে আর্টিস্টের পক্ষে বন্ধন, প্রেরণাকে সে নষ্ট করে দেয়। অভীক বলেছিল, ''স্বীকার করো, আমাকে না হলে নয়' জেনেই উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন।'' বিভা বলেছিল, ''মনে যাই থাক আমি কাঙালপনা করতে চাইনে।'' তাই দেখি বিভা অভীকের যথার্থ মানসসঙ্গিনী ও দেহসঙ্গিনী হতে পারল না, কেমন যেন রক্তমাংসহীন আদর্শের ছায়াপ্রতিমা হয়ে রইল, নিখুঁত বলেই সে মানবিক চরিত্র যার মধ্যে থাকবে বাস্তবতা এমনটি হতে পারল না। ফ্রয়েডীয় ভাষ্য অনুযায়ী বলতে পারি তার মধ্যে ছিল কামনার অবদান, যার মূলে ছিল অভিভাবক আরোপিত মূল্যবোধের অন্ধ আনুগত্য।

আর্টিস্ট অভীক বহু নারীর সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত, নৈতিকতা তার কাছে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিভার চরিত্রে রয়েছে নৈতিক শক্তি। মনের গভীরে সে লুকিয়ে রেখেছে অভীকের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম। বিভা 'প্রচণ্ড ন্যাশানালিস্ট', শুদ্ধ ভারতবর্ষপ্রেমী; অভীক আন্তর্জাতিক, সে উদার স্বদেশিকার পক্ষপাতী।

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিভা ও অভীকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন। অভীক শিল্পী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে বিলাতযাত্রায় পাড়ি দিল। সে সঙ্গে নিয়েছে বিভাকে না জানিয়ে তার হারখানি। বিনিময়ে তার একতাড়া ছবি রেখে এসেছে গয়নার বাক্সে। হারটা সে রাখছে প্রেমের স্মৃতি হিসেবে। বিভার মন যখন বিচ্ছেদের বেদনায় অভিমানী দিন গুণ ছিল তখনই সাগরযাত্রী অভীকের চিঠি এল। সে চিঠিতে রইল বিভার প্রতি তার হৃদয় বা ভালোবাসার পরম নিবেদন— ''এ কথা সত্য, মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি জান যে, তারা নীহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র।'' অভীকের দুঃখ, এ জীবন

বিভার কাছে তার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটল না। দুজন দুজনকে ভালোবাসল, তবু মিলন হল না। রবীন্দ্রনাথেরই লেখা গান মনে পড়ে যায়—

দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে
কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে
নিকুঞ্জে দখিনাবায় করিছে হায়-হায়
লতাপাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে
দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল বয়ে
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল রয়ে
অর তো হল না দেখা, জগতে দোঁহে একা
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে।

অতএব বলতে পারি প্রেমের ট্র্যাজেডিতেই 'রবিবার' গল্পের সমাপ্তি। রবীন্দ্রীয় দার্শনিকতার সাহায্যে নিয়ে হয়তো বলতে পারি, এ গল্পে নায়কনায়িকা প্রস্তুতি নিচ্ছে আত্মিক মিলনের, বিরহ ঘটনা করছে তাদের প্রেমের বিজয় সংবাদ।

চরিত্ররচনায় রবীন্দ্রনাথ মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিভার চরিত্র আছে অন্তর্মুখিনতা, অভীকের চরিত্রে বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য। The Lonely voice এ ফ্রাঙ্ক ও কনর (Frank O'cooner) ছোটগল্প সম্বন্ধে বলেছিলেন 'by its very nature remote from the community romantic, individualistic and intransigent'— ছোটগল্প রোমান্টিক, ব্যক্তিত্বধর্মী ও অবিচল— 'রবিবারে'ও শেষপর্যন্ত পরিণামে আধুনিক মনস্তত্বকে ছাপিয়ে একধরনের আত্মগত কল্পনা আশ্রিত চরিত্রপ্রবা ও রোমান্টিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখা গেল। এই গল্প লক্ষণে যতটা আধুনিক ঠিক ততটাই রোমান্টিক। হয়তো রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের ছোটগল্প সম্বন্ধে এই কথাটাই বেশি প্রযোজ্য।

৩.২.২ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : শেষ কথা :

তিনসঙ্গীর 'রবিবার' গল্পটিকে যদি 'শেষের কবিতা উপন্যাসের একটি ছোটগাল্পিক সংস্করণ বলা যায় তবে 'শেষ কথা' উপন্যাসটিকে 'বিদায়-অভিশাপ' নামক কাব্যনাট্যের একটি অনুরূপ অর্থাৎ গাল্পিক রূপান্তর বলা যায়। 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতায় দেখি দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ, দৈত্যগুরু শুত্র(চর্যের আশ্রমে গিয়েছিলেন সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখতে। 'বিদায় অভিশাপ' সাধনা পত্রিকায় ১৩০০ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, সে কবিতার মুখবন্ধে বলা হয়েছে, দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুত্র(চার্যের নিকট থেকে সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখবার নিমিত্ত তাঁর কাছে গমন করেন। সেখানে সহস্র বছর কাটিয়ে এবং নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জন করে সিদ্ধকাম হয়ে কচ দেবলোকে ফিরে আসেন। কচের কাছে তাঁর কর্তব্যকর্ম বড় হয়েছিল দেবযানীর প্রেমের চেয়ে। তাই দেবযানী বিদায়কালে কচকে অভিশাপ দিয়েছলেন, এই বিদ্যা তুমি সেখাতে পারবে, নিজে প্রয়োগ করতে পারবে না।

পঞ্চভূত গ্রন্থের 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে এ কবিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কী বিচিত্ররূপ নিতে পারে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা পরিহাসাচ্ছলে তা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন ওখানেই 'নরনারী' সম্পর্কের বিচারে; যথার্থ পু(ষ হওয়া সহজ নয়, পৃথিবীতে অনেক পুরুষ অকৃতার্থ। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, অন্তত আমাদের দেশে এই অকৃতার্থতার কি একটা কারণ কি নয় মেয়েরাই? তাদের অন্ধসংস্কার— আসক্তির্যাকৃপণতা এ ক্ষেত্রে দায়ী। মেয়েরা সেখানেই ত্যাগ করে যেখানে তাদের প্রবৃত্তি ত্যাগ করায়, তাদের সন্তানের জন্য তাদের প্রিয়জনের জন্য। পুরুষের ত্যাগের ক্ষেত্র প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে।

বস্তুত 'বিদায়অভিশাপ' কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন প্রেম মেয়েদের জীবনসর্বস্ব, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে জীবনকর্তব্য অনেকসময় প্রেমকে ছাড়িয়ে যায়। পুরুষ তখন নারীকে পিছে ফেলে জীবনের পথে এগিয়ে যায়।

স্পষ্টতই রবীন্দ্রসাহিত্যে কচ ও দেবযানীপ্রসঙ্গ পুনশ্চ উঠল ১৩৪৬-এর আশ্বিনে তার ছোটগল্প 'শেষ কথা'য় অচিরার জবানিতে। মেয়েদের সৃষ্টি পুরুষদেরই জন্য। কিন্তু বারো আনা পুরুষেরা মেয়েদের ছাড়া কাজ চলে না, কিন্তু বাকি যারা মাইনরিটি বা সংখ্যালঘিষ্ঠ, যারা সবকিছু পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছে, তাদের চলে না। তাই মেয়েদেরও উচিত হবে সব পেরিয়ে যাওয়া মানুষকে পথ ছেড়ে দেয়া। যে দুর্গম পথে মেয়েপু(ষের চিরকালের দ্বন্দ্ব, সেখানে পুরুষের জয়ই কাম্য। পুরুষের জয় অর্থাৎ নারী-প্রেম-সংসার সব ছেড়ে অজানা পথে যাত্রার সিদ্ধান্ত নেয়া। এইজন্য ''পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেখানে সে নিরতিশয় একলা, নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা, কেননা তাকে যেতে হয় সেখানে যেখানে কেউ পৌঁছয় নি।'' (দ্রষ্টব্য : গ্রন্থপরিচয়—বিদায়-অভিশাপ,সঞ্চয়িতা)।

অচিরা এ গল্পের নায়ক একদা বিপ্লবী ও পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক ভূতত্ত্ববিদ বিদেশে উচ্চশিক্ষিত গল্পকথককে বলেছিল, ''ভালোবাসার সফলতা আপনার মতো সাধকের কমানার জিনিস নয়। মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।'' নবীনমাধব দেশে ফিরেছিল কারণ সে মনে তার কাজ শুধু বিজ্ঞানের নয় তার কাজ ভারতবর্ষের। অচিরা নবীনমাধব আরো বলেছিল, ''বাংলা সাহিত্যে আপনি বোধ হয় পড়েন না। 'কচ ও দেবযানী' বলে একটা কবিতা আছে। তাতে ঐ কথাই আছে, মেয়েদের ব্রত হচ্ছে পুরুষকে বাঁধা, আর পুরুষদের ব্রত সে বাঁধন কাটিয়ে অমরলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আপনি কাটিয়ে এসেছেন মায়ের অনুনয়। একই কথা। মেয়েপু(ষের এই চিরকালের দ্বন্দ্বে আপনী জয়ী হয়েছেন। জয় হোক আপনার পৌরুষের। কাঁদুক মেয়েরা। সে কান্না আপনারা নিন পূজার নৈবেদ্য। দেবতার উদ্দেশ্যে আসে নৈবেদ্য। কিন্তু দেবতা থাকে নিরাসক্ত। শেষ পর্যন্ত আলোচ্য ছোটগল্পটির পরিণামে দেখি অচিরার সঙ্গেও নায়কের একটা বিদায়-বিচ্ছেদ ঘটেছিল। অর্থাৎ নায়ক যেন আধুনিক কচ, অচিরা যেন আধুনিক দেবযানী।

এবার চলে যাচ্ছি 'বিদায়-অভিশাপে', রবীন্দ্রনাথ কৃত নরনারীসম্পর্কের ভাষ্যে—

কচ। দেবসন্নিধানে, শুভে, করেছিনু পণ
মহাসঞ্জিবনী বিদ্যা করি উপার্জন
দেবলোকে ফিরে যাব, এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই,
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ,
এতকাল পরে এ জীবন। কোনো স্বার্থ
করি না কামনা আজি।

দেবযানী ধিক মিথ্যাভাষী।
শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে গুরুগৃহে আসি।
শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জনে
শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি আঁখি রত অধ্যায়নে
অহরহ? উদাসীন আর সবা পরে?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে, গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্য প্রফুল্লমুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মত?

'বিদায়-অভিশাপ' ও 'শেষ কথা'র ভাববস্তুর তুলনা দেখালাম, বস্তুত মানবজীবনে—পুরুষের জীবনে প্রেম ও কর্মসাধনার চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সেই দ্বন্দ্বজনিত ট্র্যাজেডির দিকে আলোচ্য ছোটগল্পটিতে লেখক ইঙ্গিত করেছেন।

অতঃপর ছোটগল্পটির প্লট, চরিত্র, ঘটনা, পটভূমি, সংলাপ মনস্তত্ত্ব, রচনাভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলছি। নায়কের চরিত্রবিচার করতে গেলে দেখি তার মধ্যে রয়েছে যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদী প্রবণতা। "মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে মা মা ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র বলেই মানব, 'দরিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। .....কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রতবুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বাঙালি বিজ্ঞানী কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে, এই কাজটাকে কবির গদগদ কণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পূজা বলে চিনতেই পারবে না।" স্পষ্ট বোঝা যায় নবীনমাধব ধর্ম ও মানবতা এবং মানব সেবাকে একত্রে মিলিয়ে দেখতে অনিচ্ছুক। সে ভাববাদী নয়, যথার্থই নিঃস্পৃহ বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিক। এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জন্যই দেশমাতৃকার ভক্তিগদগদ দেশপ্রেম তার পছন্দ নয়, বিপ্লবীপন্থাতেও তার মন টেঁকেনি, শেষপর্যন্ত দেশের খনিজ সম্পদ আবিষ্কারে মন দিয়ে সে ভেবেছে এ পথেই যে যথার্থ দেশের জন্যে কাজ করতে পারবে।

আলোচ্য নায়ক সুদর্শন সুপুরুষ মেধাবী। বিলেতে যে বিদ্যালাভ করেছে, তার প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে স্বদেশকেই বেছে নিয়েছে। "হয়তো আমার স্বভাবটা কড়া, পশ্চিমবঙ্গের শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্র চিত্ত নই"—নিজের সম্বন্ধে এই হচ্ছে তার স্বীকারোক্তি। কিন্তু এমন মানুষও নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক জন্ম রোমান্টিককে আবিষ্কার করল।—ছোটনাগপুরের অরণ্যঅঞ্চলে ভূতত্ত্ববিদের কাজ করতে এসে তার জীবনে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হল। ঘটল কিছু অবিস্মরণীয় মানবিক অভিজ্ঞতা—প্রকৃতি ও মানুষ এ দুইএ মিলে তার মনে কিছু আলোড়ন আনল। এখানে গল্প থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি——

"এইবার আমার দেশব্যাপী কীর্তিসম্ভাবনার ভাবী দিগন্তে হঠাৎ যে এতটুকু গল্প ফুটে উঠল, তাতে আলেয়ার চেহারাও আছে, আরো আছে শুকতারার। নীচের পাথরকে প্রশ্ন করে মাটির সন্ধানে বেড়াচ্ছিলুম বনে বনে। পলাশফুলের রাঙা রঙের মাতলামিতে তখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরী, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। .....সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে মহুয়াফল। ঝিরঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম তনিকা। এটা কারখানাঘর নয়, কলেজক্লাস নয়, এই সেই সুখতন্দ্রায় আবিল প্রদোষের রাজ্য যেখানে একলা মন পেলে প্রকৃতিমায়াবিনী তার উপরেও রংরেজিনীর কাজ করে—যেমন সে করে সে সূর্যাস্তের পটে।" (রংরেজিনী অর্থ যে মেয়েরা কাপড়ে রঙের কাজ করে, সুতোকে রঙে রাঙায়, পুনশ্চ কাব্যে 'রংরেজিনী' বলে একটি কবিতা আছে।)।

"এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজে ফেরায়, পাঁচটি শালগাছের ব্যূহ ছিল বনের পথে একটি ঢিবির উপরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল একটি মাত্র ফাঁকের মধ্য দিয়ে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙ্গনার গাঁটছেঁড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটা ডায়ারির খাতা নিয়ে। এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেল একটি অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্নিমার বান ডেকে আসার মতো আমার বক্ষতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ।"

''গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম। একটি আশ্চর্য ছবি চিহ্নিত হতে লাগল মনের চিরস্মরণীয়গারে। আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোনো চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যস্ত নয়। যে আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে। বরাবর জানি, আমি পাহাড়ের মতো খটখটে, নিরেট। ভিতর থেকে উছলে পড়ল ঝরণা।''

নায়কের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ বোঝা যাচ্ছে। একটি মেয়েকে ঘিরে তার হৃদয়ে বিস্ময়বোধ জেগে উঠেছে। এই নবজাগ্রত অনুভূতির ভিতর রোমান্টিক ও জৈবিক দুটি উপাদানই আছে।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় আছে—

আমি ভালোবেসেছি বাংলাদেশের মেয়েকে
যে দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন ওই মাটির শ্যামল অঞ্জন
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
নীল বনছায়ায়, গোধূলির শেষ আলোটির নিমীলনে

আলোচ্য নায়ক বিদেশিনী মেয়েদের সঙ্গে প্রবাসজীবনে মেলামেশা করেছে। কিন্তু তবু সে বাঙালি মেয়ের প্রেমের পড়ল। গল্পে নায়িকার অচিরা নামটাও নায়কেরই বানানো। যাহোক নায়করূপী গল্পকথক অপূর্ব কাব্যিক ভাষায় এই নবাগত নবর্জিত প্রেমানুভূতির আবির্ভাব বর্ণনা করেছে এ গল্পে— ''দেখতে পেলুম অচিরাকে, কুলুষিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে। এর পূর্বে বাঙালি মেয়েকে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু সবকিছু থেকে স্বতন্ত্রভাবে এমন একান্ত করে তাকে দেখার সুযোগ পাইনি। এখানে তার শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিল। ....কোন প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবীর যে তলায় লুকানো আগ্নেয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজি শাস্ত্রে তা পড়েছি, নিচের মধ্যে দেখলুম সেই নীজের তলায় অন্ধকারের তপ্তবিগলিত জিনিসকে হঠাৎ উপরের আলোতে। কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধবের অটল অন্তঃস্তরে এই উলটপালট আমি কোনোদিন আশা করতে পারিনি।'' উদ্ধৃতির শেষাংশে বর্ণিত অবচেতনার জাগরণ, জৈব কামনার উন্মেষ যা ছিল এতাবৎ অবদমিত।

বিজ্ঞানী নবীনমাধব শুধু নিজের প্রতি আরাবান নয়, সে নিজের সম্বন্ধে সচেতন এবং অহঙ্কারীও বটে। বক্তব্যের সমর্থনে কয়েক পংক্তি তুলছি— 'রোদপড়া আমার রঙ, লম্বা আমার প্রাণসার দেহ, শক্ত আমার বাহু, দ্রুত আমার গতি, শুনেছি দৃষ্টি আমার তীক্ষ্ণ, নাক চিবুক কপাল নিয়ে সুস্পষ্ট জোরালো আমার চেহারা। এপস্টাইন পাথরে আমার মূর্তি গড়তে চেয়েছিল, সময় দিতে পারিনি।'' এ চেহারার বর্ণনা যেন স্বয়ং লেখক অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, আমাদের মনে পড়ছে বিলেতে শিল্পী এপস্টাইন কৃত রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্যমূর্তিটির কথা।

অচিরার দৃষ্টিও যে নায়কের উপর পড়েছে, তার চলাচলের পথকে চাহনিতে অভিষিক্ত করেছে, গল্পে তার বর্ণনা আছে। এখানেই গল্পের আদিপর্ব সমাপ্ত। ''আমার গল্পের আদিপর্ব শেষ হয়ে গেল। ছোটগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটাকে ফলিয়ে বলবার লোভ করব না, ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাইনে।'' এখানে পাচ্ছি ছোটগল্পের আর্ট-সম্পর্কিত ইঙ্গিত। তা, ছোটগল্পের ভাবসংক্ষিপ্ত ও গঠনসংক্ষিপ্ত ''শেষ কথা'' গল্পে অবশ্যই আছে।

গল্পের আদিপর্বে যদি পাই নায়কের মনের খবর গল্পের অন্তপর্বে পাই নায়িকার মনের খবর। বিদ্যার্থীর পদস্খলনে তার সমর্থন নেই, সে যে দ্বিতীয় দেবযানী হতে পারবে না সে তার মানসের কচরূপী প্রেমিককে প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। তার নারী হয়েও এই ভালোবাসাকে গঞ্জনা দেবার ব্যাপারটা নায়ককে বিস্মিত করেছিল। অচিরা উত্তর

দিয়েছিল, "নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলি সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ।"

অচিরার পূর্বজীবনে একটা দুঃখের ইতিহাস আছে। অচিরার মাতামহ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তার মনজয় করে ছাত্ররূপী ভবতোষ। রুচিরারও মনভোলালো। অধ্যাপকের টাকায় সে বিলেত গিয়ে আই. সি. এস হয়ে এল, কিন্তু বিয়ে করল অন্য মেয়েকে। অতএব অচিরার মানসের দুঃখটা বোঝা যায়। প্রেমের ব্যাপারে এখন সে সাবধানী, কঠোরভাবে নিজেকে প্রেমপথ থেকে সরিয়ে নিতে তার দ্বিধা নেই।

অচিরা বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বময়ী। নায়ক মধ্যতিরিশ, নারীর বদলে সে যে দেশের জন্যই জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত—এটা অচিরা বুঝতে পারে। বাঙালী মেয়েরা সংসারে সঙ্গিনী হয়, কর্মব্রতে সঙ্গিনী হয় না—এ কথাও অচিরা বলেছিল। 'ভালোবাসা' আর 'প্রাণশক্তির অন্ধতা' তার কাছে সমার্থক। নবীনমাধবের ভালোবাসায় যে তৃষ্ণাঅঙ্কুর প্রচ্ছন্ন—এও তার সুদৃঢ় অভিমত। বিজ্ঞানসাধককে প্রথমে সে ভক্তি করেছে, পরে সে তার প্রতি ভালোবাসা অনুভব করছে। এবং প্রথম থেকে সদাসতর্ক অচিরা এই প্রেমের শিকড়বন্ধন আপন হাতে ছিন্ন করতে চেয়েছে। এইজন্য রবীন্দ্রঅঙ্কিত এই ছোটগল্পের নারীচরিত্রকে একইসাথে লাবণ্যময়ী ও কঠোরতার প্রতিমা বলে মনে হয়েছে। তাই শেষপর্যন্ত সে কিছুটা রহস্যের অবগুণ্ঠনেই ঢাকা থেকে যায়। তীব্র অবদমনে নায়কের জীবন থেকে সে নিজেকে ছিন্ন করে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। তার মনের গোপন চিন্তাপ্রবাহ এ গল্পে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়কের কাছেই এই নায়িকা নিজের সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত করেছিল।

"আমার ঐ পঞ্চবটির মধ্যে বসে আপনার অগোচরে কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেননি প্রখর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয়নি কারো সঙ্গের। এক একদিন মনে হয়েছে হতাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবেন নিশ্চিত করেছিলেন, সেটা পাননি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন করে যেন বলিষ্ঠ মনের জয়যাত্রা চলছে। এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনো দেখিনি। দূরে থেকে ভক্তি করেছি।"

এবং পুনশ্চ

"আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি, ছি, কী পরাজয়ের বীজ এনেছি আমার মধ্যে।"

নিজের ভিতর অচিরা অনুভব করল তৃষ্ণার জাগরণ। "যে চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল তার প্রবণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিঃশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির।" বলাবাহুল্য গল্পের পরিণতিতে দেখি অচিরা প্রেমের কাছ থেকে একটি নমস্কারে মুখ ফিরিয়ে নিল, অজ্ঞাতবাস ছেড়ে মাতামহের সঙ্গে লোকালয়ে ফিরে গেল। নায়কের কাছে তার শেষবিদায় কিছুটা যেন আত্মপ্রবঞ্চনায় ভরা। একটা আদর্শবাদের আশ্রয় অবশ্য বাইরে সে নিয়েছে, বিজ্ঞানসাধককে সে সাধনাভ্রষ্ট করতে চাইনি। আর নায়কের মনের কথা? শেষও গল্পের শেষে তার আত্মজবানিতে ফুটে উঠেছে—"মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল—বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।" রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ে যায়—"ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওড়ে পাখি।"

অতএব বলতে পারি এ গল্পের সমাপ্তিতে বিষণ্ণতার বেদনা আছে। তবে কি নায়কের স্বভাব প্রেমের সম্পর্কে ভিরু? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে! শুধু মনে হয় চরিত্র, সংলাপ, প্লট, মনস্তত্ত্ব, আঙ্গিক ও জীবনদর্শন—সব মিলিয়ে কবির শেষ দিকের গল্পটি একটি চমৎকার সৃষ্টি। কথাসাহিত্যিক হেনরি জেমসের রচনাবলী সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত

ভ্রাতা মনোবিদ উইলিয়াম জেমস মন্তব্য করেছিলেন— "an impression like that we often get of people in life ; theri orbits come out of space and lay themselves for a short time along ours, and then off they whirl again into the unknown, leaving us with little more than an impression of their reality and a feeling of baffled curiosity as to the mystery of the beginning and end of their being." (দ্রষ্টব্য The short story : Ian Reid)। বস্তুত নবীনমাধব ও অচিরা দুজনেই পরস্পরের কাছে ছিল অচেনা, তাদের কক্ষপথ হঠাৎ পাশাপাশি এসে ক্ষণকালের জন্য মিলেছিল, তারপর আবার তারা অকস্মাৎ অজানায় মিলিয়ে গিয়েছে। শুধু পরস্পরের হৃদয়ে রেখে গেছে জীবনের রহস্যঘনতার এক স্বাদ, উভয়ের জীবনের আদি ও অন্ত ভাগ্য তাদের কাছে অজানাই রেখে দিল।

৩.২.৩ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : ল্যাবরেটরি ঃ ১৩৪৭ সালে লেখা রবীন্দ্রাথের একেবারে শেষজীবনের ছোটগল্প 'ল্যাবরেটরি' বিংশশতকীয় ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যে ভরা। এই গল্পে যুগপৎ রোমান্টিকতা ও আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সোহিনীর' অদ্ভুত নারীচরিত্রই এ গল্পের কেন্দ্রগত আকর্ষণ। গল্পের কথনভঙ্গিতে, ভাষাবিন্যাসে, ঘটনার নির্মাণে ও ঘটনার দ্রুত পালাবদলে, আভাসে ইঙ্গিতে ল্যাবরেটরি উদ্যত উপস্থিতি ফুটিয়ে তোলার মুনশিয়ানায়, মনস্তত্ত্বের নিপুণ বয়নে ও নারীমনের রহস্য উদঘাটনে এ গল্পের জোড়া মেলা ভার। ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার শুধু বিজ্ঞানের নয়, এ গবেষণাগারে মানবজীবনও অনুবীক্ষণের তলায় ৱাপিত হয়েছে অথবা অপূর্ব জীবনরসায়নরূপে তার বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছে।

এই গল্পটি প্রথম বাক্য থেকে গতিবেগ সঞ্চয় করেছে— "নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা এঞ্জিনিয়ার। যাকে সাধুভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্য মান ছাত্র অর্থাৎ বিলিয়ান্ট তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরী(ার তোরণে তোরণে ছিলেন পয়লা শ্রেণীর সওয়ারী।" এই নন্দকিশোরেরই স্বপ্ন দেখা বৈজ্ঞানিক মনের উৎপন্ন ফল আলোচ্য ল্যাবরেটরি। একদিকে প্রতিভাবান অন্যদিকে অর্থ উপার্জনের বক্রপথে তার অনাস্থা ছিল না। নির্মাণকাজে যুক্ত হয়ে বস্তুত তিনি প্রচুর ধনার্জন করেছিলেন। নিজে থাকতেন সাধাসিধেভাবে একটা ছোট বাড়িতে কিন্তু "বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন মস্ত।" তিনি সৃষ্টিছাড়া লোক, মনের ভিতর বিজ্ঞানেরা পাগলামি বিদেশ থেকে দামি দামি যন্ত্রপাতি আনতেন, কারণ তিনি জানতেন এ দেশে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের, বড় ও দামি যন্ত্র ব্যবহারে সুযোগ না থাকায় ছাত্ররা শুধু পাঠ্য বই-ই পড়ে।

পরবর্তীকালে দেখি বিদ্যালোভী মানুষটি লোহার ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন। পাঞ্জাবে এসে পেলেন তাঁর জীবনসঙ্গীনিকে, বিজ্ঞানসাধনার দায়দায়িত্বে যে নারী অনায়াসে পরে গ্রহণ করবে। সোহিনীর প্রথম আবির্ভাবটি বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো— "সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাঘরা দুলিয়ে অসংকোচে তার কাছে উপস্থিত— জ্বলজ্বলে তার চোখ ঠোঁটে একটা হাসি আছে, যেন শান দেওয়া ছুরির মতো।" জ্যোতিষী বলেছে তার জন্মৱানে শয়তানের দৃষ্টি আছে। যাহোক নন্দকিশোর ব্যবসাবুদ্ধি তাকে মুগ্ধ করেছে। "মেয়েটি বললে, 'বাবু রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আখি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এখন মানুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।" নন্দকিশোরের মনের কষ্টিপাথরে এই নারীরূপী দামি ধাতুর দাগ পড়ল। "দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর ঝকঝক করছে ক্যারেকটারের তেজ"। "মেয়েটিকে সবাই ডাকত সোহিনী বলে। পশ্চিমী ছাঁদে সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা।"

নন্দকিশোর কঠোর বস্তুবাদী মেয়েটিকে গ্রহণ করেছিলেন চেহারা দেখে নয় চারিত্র্য দেখে। যে দশা থেকে তিনি মেয়েটিকে উদ্ধার করে এনেছিলেন সেটা খুব নির্মল বা গোপন ছিল না। উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যার ছাঁচে গড়ে

তুলেছিলেন সযত্নে। তাঁর একটি কথায় দাম্পত্য সম্পর্কের মূল ভিত্তি পাচ্ছি— ''পতিব্রতা স্ত্রী যদি চাও, আগে ব্রতের মিল করাও।'' নন্দকিশোর চরিত্রও গল্পলেখক একটি বাক্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন— ''কিন্তু ঐ একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না।'' অতএব তাঁকে ও সোহিনীকে নিয়ে জনরবে তিনি ছিলেন অবিচলিত।

''নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রৌঢ় বয়সে কোনো এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে। গল্পের এই অংশে দেখা পাচ্ছি তাদের মেয়ে নীলিমা অর্থাৎ নীলার। ''মেয়েটি একেবারে ফুটফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল— মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতবর্ণের আভা, চোখেতে নীলপদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।'' সোহিনী একদিকে বিদূষী করে গড়ে তুলছে মেয়েকে অন্যদিকে বুক দিয়ে আগলে চলছে ল্যাবরেটরিকে। কিন্তু নীলার রক্তে ছিল নিষিদ্ধের ও উদ্দামতার বীজ। নীলার জীবনে বহু যুবকের আনাগোনা কিন্তু সবটাই বাহিরদ্বারে, ভিতরে সোহিনীর সতর্ক প্রহরা।

গল্পের এই অংশে আবির্ভাব হল নায়কের, অবশ্য তাকে যদি নায়ক বলা যায়। ''কিছুদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করেছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে সায়ান্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর দুটো একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।'' সোহিনী ল্যাবরেটরি গল্পে এই রেবতীকে তার প্রয়োজনে লাগানোর চেষ্টা করেছিল। সে প্রয়োজন অবশ্য মহৎ ল্যাবরেটরির দেখাশোনা ও উন্নতিবিধান।

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার কলাকৌশল সোহিনী অবশ্য ভালোই জানে। রেবতীর ভূতপূর্ব বিজ্ঞান-অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী উত্তরকালে সোহিনীর বান্ধব। নারীর মোহিনীমায়ায় তিনিও বাঁধা পড়েছেন, কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে একটা প্লেটোনিক দূরত্ব ছিল। সোহিনী মন্মথকে বলেছিল, ''জানেন বো হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যবরেটরিতে বসিয়ে দেব বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যর কথা।''

সোহিনী চরিত্র আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করে তার একনিষ্ঠ নারীধর্মের কারণে। প্রচলিত অর্থে সে সতী নয়, কিন্তু বিগত স্বামীর সাধনাকে সে আপন করে নিয়ে নিজের মূল্য সপ্রমাণ করেছে। উন্মাদিনীর মতো একমুখী অবিচলভাবে সে ল্যাবরেটরিকেই জীবনের ধ্যানজ্ঞান করেছিল, এইখানে ল্যাবরেটরি ছোটগল্পটির নামকরণের যথার্থ্য। অন্যদিকে এখানে রবীন্দ্রনাথ জীবনরসায়নগারে অণুবীক্ষণের তলে অথবা দ্রবণের মধ্যে ফেলে বিভিন্ন মানবচরিত্রের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন— সোহিনী, নন্দকিশোর, রেবতী, নীলা, মন্মথ এমনি সব চরিত্রে তিনি ছোটগল্পের স্বপ্ন পরিসরে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ-ও গল্পের নামকরণের ব্যঞ্জনাকে বহন করেছে। গল্পকারের কৃতিত্ব তিনি বাংলা সাহিত্যকে সোহিনীর মতো ব্রত নারী চরিত্র উপহার দিতে পেরেছেন।

ঊনিশ শতক বঙ্গদেশে ছিল রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ। রেনেসাঁসের মূলকথা প্রাচ্যসভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে পাশ্চাত্যসভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে মিলিয়ে নেয়া। একালের মনীষীরা বিদ্যাসাগর-মাইকেল মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই এই সমন্বয়ের সাধনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই দলভুক্ত। ঊনিশশতকীয় রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণ নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার প্রসার। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নারীর স্বাধিকার ঘোষণার শঙ্খধ্বনি শোনা গেল মহুয়া কাব্যের 'সবলা' কবিতাতেই শোনা গেল রমনীর এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর—

যাব না বাসরকক্ষে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।

চোখের বালি উপন্যাসের বিনোদিনীর মধ্যে নারীবিদ্রোহকে দেখা গেল। পুরুষের বর্মআবৃত নিরাপদ জগতে তার

আবির্ভাব বজ্র এ বহ্নির মতো। তারো আগে দেখা গিয়েছে 'চিত্রাঙ্গদা'-কে। ঘরেবাইরে উপন্যাসের বিমলা চরিত্র নারীর নিজস্ব সত্তাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছে নষ্টনীড়, 'স্ত্রীরপত্র' প্রভৃতি ছোটগল্পও এই পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণীয়। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনীকেও এই পরিমণ্ডলে রেখেই বিচার করতে হবে। এক স্বাধীন তেজস্বিনী স্বনির্ভর নারী যে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সংসারে পুরুষের পরাধীনে অথবা পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়। নন্দকিশোরের কাছে এই একদা স্বৈরিনী রমণীর আত্মসমর্পণ সে হচ্ছে বীরঙ্গনার বীরপূজা। স্বামীর ল্যাবরেটরিকে স্বামীর মৃত্যুর পর বুক দিয়ে রক্ষা করা ও জীবনের ধ্যানজ্ঞান করে তোলা তাকে যথার্থ অর্থেই সতী ও বীরাঙ্গনা করেছে। প্রচলিত সতীত্বের ধারণা দিয়ে সোহিনীকে বিচার করা যাবে না। বিনোদিনী, বিমলা, টলস্টয়ের আনা কারেনিনা, ফ্লবেয়ারের মাদামা বোভারি ইত্যাদি বিশ্বসাহিত্যে নতুন যুগের বিদ্রোহিনী নারীদের সঙ্গে তার মানুসেরসাম্য অল্পবিস্তর খুঁজে পাওয়া যায়।

সোহিনী কখনই ভুলে যায়নি ''নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য।'' এইখানেই সোহিনী অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরীর সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেছিল কিছুটা তুলে দিচ্ছি। ''আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার পথ পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পূজার দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধুপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘন্টা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর ঘৃণাকে। তাঁর দৈনিক পূজা ছিল, এইসব যন্ত্রতন্ত্র ঘিরে রাখত কলেজের ছাত্ররা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর আমিও বসে যেতুম।'' স্বামী চলে যেতেন কাজে, ভাবুকদের মন আশেপাশে ঘুরঘুর করত।'' 'বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। দুচার জনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মদ্যে মুচড়িয়ে ধরে।'' ''মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি। সত্যি কথা বলতে আমার নাম বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদী-কুন্তীদের সেজে বসতে হয় সতীসাবিত্রী। ..... ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেননি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাপ দিয়েছি সহজে পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি। কিন্তু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। যাই হোক, তিনি যাবার পতে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমোর আগুন।'' ''দেখলুম জুটেছে তারা আমার চেকবইয়ের দিকে লক্ষ্য করে। ভেবেছিল মেয়ে মানুষের মোহ মরতে চায় না, ভালোবাসার সিঁধের গর্ত দিয়ে পৌঁছবে তাদের হাত আমার টাকার সিন্দুকে। এতে রস আমার নেই, তারা তা জানত না। আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারেনি। আমার প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। এদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেননি।'' বোঝা যাচ্ছে সোহিনী চরিত্র একইসাথে সতী ও অসতীর বিষম ধাতুতে গড়া, কিন্তু তার নারীত্বকে প্রচলিত মূল্যবোধ ও সমাজনীতি দিয়ে বিচার করা যাবে না। সে যে পরম নিষ্ঠাবতী ল্যাবরেটরিকে কেন্দ্র করে সপ্রমাণ করছে নারীত্বের অগ্নিপরীক্ষায় অবশ্যই সে সসম্মানে উতরে যেতে পারে। তার আত্মস্বীকৃতিতেই পরিচয় তার মধ্যে বহুগামিতা ছিল, বিবাহিত জীবনেও দেহের জ্বালা তাকে ভ্রষ্টা করেছে, এমনকি নীলার পিতৃপরিচয়েও রয়েছে সংশয়। কিন্তু তার অকপট স্বীকারোক্তিই তাকে ভণ্ডামির হাত থেকে রক্ষা করেছে।

সোহিনীর চরিত্রের মধ্যে আমরা একটা বিবর্তন রেখা লক্ষ করি। প্রথমে সে ছিল শুধু সুখের সন্ধানে থাকা এক স্বৈরিনী। নন্দকিশোরের সঙ্গে সম্পর্করচনার পর নয়, নন্দকিশোরের মৃত্যুর পরই এই সুখসন্ধানী চারিত্র্য পালটে

গেল। সুখকে বিসর্জন দিয়ে সে যেন এক কৃচ্ছসাধনায় ব্রতী হল, ল্যাবরেটরি হয়ে উঠল তার সাধনপীঠ। বাস্তবতার দাবী তাকে স্বেচ্ছাচারিতার সুখময় স্রোতোপথ থেকে সরিয়ে এনেছে। এখানে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণের সুত্র দিয়ে সোহিনীর চরিত্র কিছুটা ব্যাখ্যা করতে পারি—"The ego discovers that it is enavitable for it to renounce immediate satisfaction to put up with a little unpleasure and to abandon certain sources of pleasure altogether. An ego thus educated has become 'reasonable'; it no longer lets itself be governed by the pleasure principle, but obeys the reality principle, which also at bottom seeks to obtain pleasure, but pleasure which is assured through taking account of reality, even though it is pleasure postponed and diminished." (Sigmund Freud : Introduction Lectures on Psychoanalysis)। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব দিয়ে সোহিনী চরিত্র বিচার করলে মূলকথা এই বলতে পারি যে, তার আত্ম বা অহং এই অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। সুখ ও স্বপ্নের পথ দিয়ে চলা আপাতত থামাতে হবে অথবা একেবারেই থামাতে হবে, সুখভোগকে সাময়িক স্থগিত করা এমন কী কিছু অ-সুখকে জীবনে বরণ করে নেয়া, এমনকি প্রয়োজনে কোনো কোনো সুখের উৎসকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। বস্তুত এভাবেই সুখভোগনীতি বা 'pleasure principle' সোহিনীর জীবনে 'reality-principle' বা বাস্তবতার নীতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ওখানেও এক ধরনের সুখবোধ আছে, কিন্তু এই সুখ বা আনন্দ বাস্তবকে বর্জন করে নয় গ্রহণ করে। ল্যাবরেটরিকে ঘিরে সোহিনীর জীবনস্রোত এ গল্পের দ্বিতীয়ার্ধে মূল আবর্ত থেকে সরে এসে এক ভিন্নতর আবর্তের সৃষ্টি করেছে। যে ছিল বিলাসিনী সে হয়ে উঠল কৃচ্ছসাধিকা।

গল্পলেখক সোহিনীর সঙ্গে তার কন্যা নীলিমার কামনাবাসনা ও উদ্দেশ্যের সংঘাতও দেখিয়েছেন। নিলীমা চরিত্র সোহিনী চরিত্রের তুলনায় ফিঁকে রঙে আঁকা। স্বাভাবিক সুস্থ যুবতীর ইন্দ্রিয়মূলক উপভোগবাসনাই তার মধ্যে তীব্রতা অর্জন করেছে। মায়ের প্রতি তার আনুগত্য, বিদ্রোহ ও মায়ের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আলোচ্য গল্পে চমৎকার ফুটেছে।

"মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদূষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়।" অর্থাৎ যে আনন্দ সোহিনী ভোগ করেছিল, মেয়ে সে আনন্দ ভোগ করুক সোহিনী তা চায় না। "মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। ..... অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়।"

সোহিনী নির্বাচিত করল রেবতীকে, উচ্চশিক্ষিত নবীনবিজ্ঞানী একদিকে সে হবে নীলার উপযুক্ত পাত্র, অনদিকে ল্যাবরেটরির সুযোগ্য কর্ণধার। রবীন্দ্রনাথ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, নারীর মোহিনীমায়া বিস্তার সবই চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। কখনো তিনি সাহায্য নিয়েছেন বিশ্লেষণের, কখনো আভাসইঙ্গিতের। "মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হ'ল বোটানিক্যালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলে পড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ করা স্যান্ডেল।

যে আকাশনিম গাছের তলায় রেবতী রবিবার কাটায় সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানেই এসে তাকে ধরলে।"

অথবা ভিন্ন অংশে—"ইতিমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তন্নতন্ন করে দেখে নিতে লাগল। রঙ মসৃণ শ্যামবর্ণ, একটু হলদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগুলো আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড়ো নয়, কিন্তু তাতে

দৃষ্টিশক্তির শক্ত আলো জ্বলজ্বল করছে, মুখের মধ্যে সেইটের সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নীচে মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম।''

এবং পুনশ্চ ''নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা।.....রেবতীর দৃষ্টি এক মুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে দিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে তখন দৃষ্টির অমৃতওকে তাড়াতাড়ি একচুমুকে গিলতে হয়।''

রেবতী সম্বন্ধে সোহিনী অধ্যাপক চৌধুরীকে বলেছিল, 'তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচবার শখ মেটাবার জন্যে এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাকে চরম রে মারব স্বামীঘতিনী হয়ে। আমি এর রক্ষক চাই, তাই খুঁজছিলাম রেবতীকে।''

নীলা মায়ের বিরুধে বিদ্রোহ করে তার অভিভাবকত্ব থেকে বেরিয়ে এসে আপন পায়ে দাঁড়াতে চায়। প্রমাণ নীচের বাক্যে— ''নীলা মাকে বললে, আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাট দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।''

নীলার প্রতি মোহ ল্যাবরেটরিতে কর্মমগ্ন রেবতীর কুমার মনে যে মোহ বিস্তার করেছে, রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য ছোটগল্পে তার সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন— সময় রাত্রি দুটো— ''এমন সময় দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাতকাপড়-পরা, পাতলা শিল্কের কামিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।'' লক্ষ করি লেখক তাঁর শেষদিককার গল্পে দেহবাস্তবের বর্ণনাতেও বিমুখ নন।

''রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর চিন্তাসূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে। ''

আধ্বের্যের কথা ল্যাবরেটরির স্বার্থেই যে সোহিনী নীলা ও রেবতীর পরিণয় চেয়েছিল, সেই কিন্তু ভিতরে ভিতরে নীলা ও রেবতীর প্রণয়ের বিরোধী হয়ে উঠল। তার মনে হল রেবতীর নবজাগ্রত রূপমোহর ছিদ্রপথে ল্যাবরেটরির প্রতি কর্তব্যকর্মে অবহেলা ঘটবে।

গল্পের শেষের দিকে দেখি রেবতীর সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠেছে, নীলাও তাকে পতিত্বে পেতে আগ্রহী। ''নীলা বললে, কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজিস্ট্রি অপিসে নোটিস তো দেয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও না কি।''

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, 'মরে গেলেও না।'

গল্পের সমাপ্তিটা কিন্তু অতর্কিত ও কিঞ্চিৎ হাস্যকর। এ যেন অনেকটা হহুরম্ভে লঘুক্রিয়ার মতো। ''হঠাৎ আর একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রেবি চলে আয়। সুড়সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবারও ফিরেও তাকাল না।'' ল্যাবরেটরি গল্পের এই পরিণাম রেবতীকে দুর্বলচিত্ত পুরুষ

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আশ্চর্য নীলা চরিত্র একই সময়ে ধীরে ধীরে বলশালী স্বনির্ভর হয়ে উঠছিল। এমন হতে পারে রবীন্দ্রনাথ গল্পটাকে হয়তো পুরো শেষ করলেন না। পাঠকপাঠিকার মনে এই উদ্যত আশা রেখে দিলেন রেবতী আবার ফিরে আসতেও পারে।

গল্পের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে অধ্যাপক চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু রেবতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক নন, সোহিনীর সঙ্গে তার একটি মধুর সম্পর্ক আছে যা প্রায় প্লেটোনিক অর্থাৎ দেহকামনা বর্জিত। অবশ্য সক্রিয়ভাবটা কিঞ্চিৎ সোহিনীর দিক থেকেই। আসলে সোহিনী হচ্ছে সেই জাতের নারী যে কোনো পুরুষকে অবলম্বন না করে বাঁচতে পারে না। ''সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে চট করে সরে গেল, ভালো মানুষের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।'' সোহিনীর এই সাহসী আচরণ বুঝিয়ে দেয় চরিত্র হিসেবে সে প্রথামাফিক নয়, গতানুগতিকের ঊর্ধ্বে। অন্যদিকে ল্যাবরেটরি গল্পে শৈশবে মায়ের মৃত্যুর কারণে আচারনিষ্ঠ পিসিমার হাতে মানুষ রেবতীর ভিতরে পুরুষ চরিত্রের খর্বতাই প্রদর্শিত হয়েছে বিশেষত নারীর সঙ্গে সম্পর্কে।

ল্যাবরেটরী গল্পটির একটা বৈশিষ্ট্য এখানে মাঝে মধ্যে লেখক কিছুটা হাস্যরসের উপাদানও তৈরি করেছেন। যেমন রেবতির পিসিমার পিছে পিছে চলে যাওয়া। একটা হালকা ঝকঝকে ভাষাও লেখক এ গল্পে ব্যবহার করেছেন। গল্পবলার ভঙ্গিটা একই সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত ও অনায়াস সহজ। আঙ্গিকের দিক থেকে এখানে বড় গল্পের লক্ষণ, কিন্তু এ গল্পে উপকরণ বাহুল্য একটুও নেই। গল্পের নাম ল্যাবরেটরি অতএব রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক আবহ রচনাতেও পিছপা নন। ''ঐ দেখ দুটো গ্যালভানোমিটার, একেবারে হাল কায়দার। এই দেখ হাই ভ্যাকুয়াম গল্প, আর এটা মাইক্রোফটোমিটার''— এখানে অধ্যাপক চৌধুরী সোহিনী সমতিব্যাহারে রেবতীর সঙ্গে ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতির পরিচয়সাধন করাচ্ছেন।

সর্বশেষ বলতে পারি ল্যাবরেটরি গল্পটির উপসংহারে অপ্রত্যাশিত চমক রয়েছে। পাঠকমন যে ধরনের প্রস্তুতির জন্য যৌক্তিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিল সেটা হয়নি। ছোটগল্প অবশ্য তার পরিণাম ব পরিণতিতে সবসময় পাঠকের প্রত্যাশা মেনে চলে না। ছোটগল্প তার বিন্যাসও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যাশাকে কিছুটা পূর্ণ করতে চাইলেও তা যে ওই উদ্দেশ্য ও কারণকে সবসময় সুস্পষ্ট করবে তা নয়। গোগোল এবং পো এবং গোগোলের সময় থেকে একালের ছোটগল্প তার সমাপ্তিতে অধিকতর খোলামেলা ভাব অথবা অনিশ্চয়তা দেখিয়েছে। শেষটা কেমন হবে তা বোঝা যায় না অর্থাৎ তা পূর্ব নির্ধারিত নয়— ''.....short stories do not so much fareground closure as the audience's anticipation of closure. Short stories are everywhere shaped by our expectation of an imminent teleology, but it does not follow that they will display such a technology. Indeed the development of the short story since gogol and Poc. the so called modern short story, is marked by a movement toward endings of greater openness or indeterminacy.'' (Short story at the Crossroad : ed by. susan Lohafer)। ল্যাবরেটরি ছোটগল্পটির উপসংহারে এই খোলামেলাভাব বা অনিশ্চয়তার ছাপ আছে সন্দেহ নেই।

৩.৩ গ্রন্থপঞ্জি অথবা পঠনীয় গ্রন্থ ঃ

রবীন্দ্রনাথ : গল্পগুচ্ছ

রবীন্দ্ররচনাবলী, নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রবীন্দ্রজীবনকথা : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প
প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা
Ian Read : The short story
Sigmund Freaud : introductory Lectures on Psychoanalyssi ; Penguin
Susan Lohafer, ed. : short story at the Crossroad.

৩.৪ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী ঃ

১। ছোটগল্পের থিয়োরি অথবা শিল্পতত্ত্বসংক্ষেপে বর্ণনা করো ও সেই শিল্পতত্ত্বের আলোকে ''তিনসঙ্গী''র গল্পগুলির বিচার করো।

২। ''রবিবার'' ছোটগল্পটি বিশ্লেষণ করো ও ছোটগল্প হিসেবে এর সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

৩। ''শেষ কথা'' ছোটগল্পটি বিশ্লেষণ করো ও ছোটগল্প হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও।

৪। 'ল্যাবরেটরি' ছোটগল্পটি বিশ্লেষণ করো ও ছোটগল্পের শিল্প এখানে কীভাবে ফুটেছে সংক্ষেপে বলো।

৫। ল্যাবরেটরি গল্পের সোহিনী চরিত্র নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সে কোন নতুন বার্তা এনেছে?

৬। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারায় 'তিনসঙ্গী'র স্থান নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখো।

৭। 'তিনসঙ্গী'তে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য কী দেখেছ বলো।

অথবা

'তিনসঙ্গী'র যে কোন একটি গল্প অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের ওই বিশেষ ছোটগল্পটির আঙ্গিকে নিয়ে আলোচনা করো।